ফেরা ২

বই :	ফেরা-২
মূল :	বিনতু আদিল
অনুবাদ :	সাদিকা সুলতানা সাকী
সম্পাদনা :	আকরাম হোসাইন
বানান ও ভাষারীতি :	যাহিদ আহমাদ, এইচ. এম. সিরাজ
প্রচ্ছদ :	সমকালীন গ্রাফিক্স টীম

সমকালীন প্রকাশন

Scanned with CamScanner

ফেরা

বিনতু আদিল

প্রথম প্রকাশ

একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০

গ্রন্থস্বত্ব

প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ফটোকপি, মুদ্রণ, বই, ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় প্রকাশ এবং অনুবাদ নিষিদ্ধ। গবেষণা, শিক্ষা বা সচেতনতার উদ্দেশ্য ব্যতীত বইয়ের অংশবিশেষ কোনো ব্যক্তিগত ব্লগ বা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ফাইল ট্রান্সফার ও ই-মেইল অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

একমাত্র পরিবেশক

চর্চা গ্রন্থ প্রকাশ

১১/১, ইসলামি টাওয়ার (তৃতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

Published by Somokalin Prokashon Limited, Dhaka, Bangladesh

Price : Tk. 172, US $ 10.00 only.

ISBN : 978-984-94844-1-7

সমকালীন প্রকাশন

১১/১, ইসলামি টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা : ০১৬১৬-৬২৬-৬৩৬

Scanned with CamScanner

প্রকাশকের কথা

সত্য এবং মিথ্যার দ্বৈরথ পৃথিবীতে সার্বজনীন। এই দ্বন্দ্ব ও দ্বৈরথের ভেতর দিয়ে আমাদের খুঁজে নিতে হয় পরম সত্যকে। ছুড়ে ফেলতে হয় মিথ্যের সকল মোহাচ্ছন্ন আবরণ। সত্যের চারপাশে ভিড় করে থাকে অসংখ্য অর্থহীন অসত্য। এই অসত্যের দেয়াল ভেদ করে সত্য পর্যন্ত যারাই পৌঁছাতে পেরেছে, তারাই হয়েছে সফলকাম।

জাগতিক নিয়মে, সব পাখি নীড়ে ফেরে। ফুল ফোটে, বৃষ্টি নামে এবং নদী তার আপন পথে বাঁক নেয়। কিন্তু, ফেরে না কেবল মানুষ। অহংকার আর অহমিকার দহনে তার বুকের ভেতরে জিইয়ে রাখে পাহাড়সম আগুন। সেই আগুনে ঝলসে যায় সে নিজে এবং ঝলসে দিতে চায় তার চারপাশ। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ আর বেপরোয়া। সে তার অস্তিত্বের কার্যকারণ ডিঙিয়ে নিজেকে আমিত্বের আসনে দেখতে চায়। নিজের ক্ষুদ্রাকৃতির প্রতি চূড়ান্ত ভাবলেশহীন হয়ে সে নিজেকে অনন্ত-অসীমে কল্পনা করে বসে। ফলে সে বিচ্যুত হয়। পদস্খলন ঘটে তার। যুগে যুগে যাদের ধ্বংসের পদধ্বনি আমরা শুনতে পাই, তাদের সকলের যেন একই গল্প, একই চিত্রনাট্য—ঔদ্ধত্য, অহংকার আর অনাচার। এক মহাসত্যকে পাশ কাটিয়ে, নিজেকে নিয়ন্ত্রকের আসনে যখনই সে আসীন করতে গেছে, তখনই ধ্বংস অনিবার্য হয়ে নিপতিত হয়েছে তার ওপর।

তবু, কারও কারও গল্পটা অন্যরকম। তবু, কেউ কেউ ফিরে আসে। খুঁজে পায় পথ। খুঁজে নেয় অন্তিম অবসরের অনন্ত আবাসস্থল। ফিরে আসা এমন দুটো পবিত্র আত্মার যাপিত-জীবনের রং-তুলিতে নির্মিত আমাদের *ফেরা*-২।

Scanned with CamScanner

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখনিঃসৃত বাণী থেকেই আমরা বিশ্বাস করি, প্রতিটি মানবপ্রাণ অবিমিশ্র সত্যের ওপরই জন্মলাভ করে। পরম পবিত্র দ্বীনের ওপরই ধরায় তাদের আগমন ঘটে। কিন্তু, সময়ের সকরুণ বাস্তবতায়, পরিবেশের প্রতিকূলতায়, প্রকৃতির প্রহসনে তারা ভিন্ন পথ এবং ভিন্ন মতের দিকে ধাবিত হয়। বিশ্বাসের যে অমিয় পেয়ালা মুখে নিয়ে তারা নিজেদের অস্তিত্বের জানান দেয়, সেই পেয়ালা আস্তে আস্তে নানা রূপ আর নানা রং ধারণ করে। নতুন পথ এবং নতুন মতের সংমিশ্রণে তাতে এসে জমা হয় অসংখ্য নুড়ি পাথর, পলি-কাদা আর আবর্জনা। সেই নুড়ি পাথরের স্তূপ মাড়িয়ে, পলি-কাঁদার সেই আস্তরণ সরিয়ে, আবর্জনার জঞ্জালকে পাশ কাটিয়ে সেই ধ্রুব সত্যকে আর উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না, যে ধ্রুব সত্য তারা বহন করেছিল অস্তিত্বের সময় থেকে। তারা এক ঘোর অন্ধকারে ডুবে থাকে। গভীর তমসার স্রোতে তারা মজে থাকে বাকিটা জীবন।

কিন্তু, গল্পের ভেতরেও গল্প থাকে, পরিচ্ছেদের ভেতরেও থাকে উপ-পরিচ্ছেদ। আমাদের গল্পটা ভিন্ন। এই গল্পটা একেবারে ডুবে যাওয়ার গল্প নয়, বরং ডুবতে ডুবতে হঠাৎ মাঝ-সাগরে জাহাজের মাস্তুল পেয়ে যাবার মতোই। এই গল্পটি হারিয়ে যাবার গল্প নয়, বরং নিজেকে নতুনভাবে ফিরে পাবার উপাখ্যান। তাই, এই গল্পটি একটু অন্যরকম।

দুজন হিন্দু বোন, যারা আশৈশব দেব-দেবীর পূজো-অর্চনা করেছে, মণ্ডপে যারা নিবেদন করেছে গভীর অনুরাগের নৈবেদ্য, তারা কোন জাদুকরী মন্ত্রে খুঁজে পেল ইসলাম? মন্দিরের ঘণ্টার শব্দ, পূজো-পার্বনের কীর্তনের সুর যাদের রক্তে মেশা, তারা কেনই-বা মগ্ন হলো মিনার থেকে ধেয়ে আসা আযানের ধ্বনিতে? *ফেরা-২* এমনই এক যাপিত-জীবনের উপাখ্যান, কিংবা মহাকাব্যের চেয়েও বেশি কিছু।

মূল বইটি উর্দু ভাষায় রচিত। লেখিকা বিনতু আদিলের জন্য আমাদের অন্তরের গভীর থেকে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আর দুআ রইল। আর জীবনের নতুন অনুচ্ছেদ যারা শুরু করতে যাচ্ছেন তাদের জীবন রঙিন এবং সুখময় হবে, অনন্ত আখিরাতে রহমানের আরশের সুশীতল ছায়ায় আশ্রিত হয়ে ধন্য হবেন, এই আমাদের প্রত্যাশা। সাথে, এই বইটি এমন হাজারো পথহারা পথিকের জন্য পথ খুঁজে পাওয়ার দিশা হবে, ঘুম ভাঙানোর কারণ হবে, এই কামনা।

প্রকাশক

সমকালীন প্রকাশন

Scanned with CamScanner

আমার কিছু কথা

ঈমান। আপনার-আমার জীবনের সবচেয়ে দামি সম্পদ। এত দামি সম্পদ পাবার জন্যে আমাদের সংগ্রাম বা অধ্যবসায় করতে হয়নি বলে সম্পদটির মূল্য আমরা বুঝতে পারি না। কিন্তু এই পৃথিবীর বুকে এমন অগণিত মানুষ জন্মেছেন, যারা পৈত্রিক সূত্রে মুসলিম ছিলেন না। আমাদের মতো ইসলাম নামক সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মানোর সৌভাগ্য তাদের হয়নি। তারা ছিলেন ঈমান ও ইসলাম থেকে লক্ষ যোজন মাইল দূরের কোনো এক অন্ধকার জগতের বাসিন্দা। এরপর জীবনের কোনো এক সোনালি সন্ধ্যায় তারা ইসলামের অনিন্দ্য আলোর উদ্ভাস দেখতে পান। সময়ের সাথে বন্ধুর পথে হাঁটতে গিয়ে তারা খুঁজে পান মহান রবের পরিচয়।

আমার পরম সৌভাগ্য যে, এমন অনেক নওমুসলিম ভাই-বোনের আত্মজীবনী ও সাক্ষাৎকার পড়ার সুযোগ হয়েছে। সত্যি করে বলছি, সেসব লেখা পড়তে গিয়ে আমি প্রতিবারই ঈমানের দাম নতুন করে বুঝতে শিখেছি। জীবনের অন্ধকার সড়কে আলোর সন্ধান খুঁজে বেড়ানো সেই পথিকদের জীবনগল্পগুলো আমার কাছে সঞ্জীবনী সুধা মনে হতো।

সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের জীবনীতে পড়েছি, তারা কোথাও একত্র হলে বলতেন, 'এসো ভাই, একসঙ্গে বসে এমন কিছু দ্বীনি কথা আলোচনা করি, যার দ্বারা আমাদের ঈমান আরও চাঙা হবে।' ঈমান জাগানিয়া কথা বলতে তারা খুব বেশি ভালোবাসতেন। অথচ আমরা? হেলাফেলা আর গল্প-আড্ডায় কাটিয়ে দিই সারাবেলা। আর দিনকে দিন আমাদের ঈমান হয়ে পড়ে দুর্বল থেকে দুর্বলতর।

Scanned with CamScanner

এ বইতে অমুসলিম দু-বোনের ইসলামগ্রহণের এক দুঃসাহসী সত্য ঘটনা উঠে এসেছে। মনিকা ও নীলম সেই দুই সহদোরা বোন। পাকিস্তানের সীমান্ত অঞ্চলের একটি হিন্দু পরিবারে তাদের জন্ম। অকল্পনীয় ত্যাগ স্বীকার আর সীমাহীন কষ্ট সহ্য করে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এরপর দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ঈমানের আলোয় আলোকিত হওয়া থেকে শুরু করে আদালতের চৌহদ্দি ডিঙানো পর্যন্ত এক হৃদয়বিদারক উপাখ্যান নিয়ে রচিত হয়েছে বইটি।

পাকিস্তানি লেখিকা বিনতু আদিলের *খমিরি মুসালমান* নামক একটি উর্দু বই বেশ ক'বছর আগে আলোর মুখ দেখে। বইটি আমি যতবারই হাতে নিয়েছি, প্রতিবারই আমার হৃদয়ের দ্রবীভূত বাষ্পগুলো দুচোখ বেয়ে অশ্রু হয়ে ঝরে পড়েছে। এক অবলা নারীর জন্যে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের হাজারো বাধা ডিঙিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ কখনোই মসৃণ নয়। চরম কণ্টকাকীর্ণ সেই পথের বাঁকে বাঁকে হাজির হয় দুর্ভেদ্য সব অন্তরায়। শক্ত প্রহরা যেন বিরাজমান থাকে সদাসর্বদা। পরাভূত করে দেবার মতো দাপুটে শক্তির অভাব নেই চারপাশে। আশ্চর্যের বিষয় কী জানেন, সেই পাহাড়সম বাধার সামনে তারা মাথা নত করেননি। দমে যাননি একটি বারের জন্যও। বিচ্যুত হননি তাদের ঈপ্সিত লক্ষ্য থেকে। বিশেষ করে বড় বোন মনিকার ঈমানি প্রত্যয় ছিল অদম্য। হার-না-মানা সেই দুই সাহসিনীর এগিয়ে যাওয়ার গল্প আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে বারবার।

বইটির পাতায় পাতায় রয়েছে ঈমানকে আরও মজবুত করে তোলার যথেষ্ট খোরাক। কখনো যদি আমাদের ঈমানের ওপর খড়্গ নেমে আসে, কখনো যদি বস্তুবাদের ঝড়ের মুখে ঈমানি শক্তিটুকু দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন আমরাও যেন মনিকাদের মতো আদর্শের বাহক হয়ে সযতনে ঈমানটাকে জিন্দা রাখতে পারি, সে তাওফিক আল্লাহ আমাদের সবাইকে দান করুন। আমিন।

আল্লাহর করুণা ও দুআপ্রার্থী

সাদিকা সুলতানা সাকী

Scanned with CamScanner

লেখিকার কথা

এ মুহূর্তে আমি আসলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। যে মহৎ বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে বইটি রচিত হয়েছে, সে-সম্পর্কে পাঠকদের সামনে কীভাবে নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করব, ভেবে পাচ্ছি না। দুজন অমুসলিম কিশোরী বোন দ্বীনের বাগিচায় প্রবেশের পথে যেভাবে একের পর এক কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়েছে, যে ঈমানদীপ্ত দুঃসাহসিকতার সাথে পৈত্রিক কুফরি জীবনকে বিদায় জানিয়েছে, তার বিবরণ তুলে ধরতে আমার কলম অপারগ। দুজন অবলা কিশোরীর ইস্পাতদৃঢ় হৃদয় যে অমিতচেতা মনোবলের সাথে পদে পদে বাতিলের মোকাবেলা করে এত দূর এসেছে, তাদের প্রত্যয় তুলে ধরার মতো যথার্থ শব্দ-বাক্য আমার কাছে নেই।

ইসলামের ইতিহাসে এমন অনেক ব্যক্তিত্বের আগমন ঘটেছে, যারা ঈমানের পেয়ালা থেকে এক চুমুক সুধা পানের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় অবলীলায় নিজেকে জীবনের চরম পরীক্ষার মুখে ঠেলে দিয়েছেন। আল্লাহর পথে তীব্র থেকে তীব্রতর কষ্টের ধকল হাসিমুখে সহ্য করেছেন। তাদের সেই ত্যাগ-বিসর্জন ও নানাবিধ কুরবানি আল্লাহ তাআলা কবুল করেছেন।

এ বইটিতে সে ধরনের অল্প কিছু ঘটনা উঠে এসেছে। নয়তো এ ধরনের আরও অজস্র ঈমানদীপ্ত ঘটনা ইতিহাসের বিভিন্ন ছোট-বড় গ্রন্থে টইটুম্বুর হয়ে আছে। আমাদের যাপিত জীবনের আশপাশ খুঁজলে এমন কিছু ঘটনা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

Scanned with CamScanner

এ ঘটনাগুলো কিন্তু জীবনের নতুন এক একেকটি বাঁক। অতীতের অন্ধকার জীবনের বলয় ভেঙে আলোকিত জীবনের দুয়ারে কড়া নাড়ার এই মুহূর্তগুলো একদিকে কষ্টমুখর হলেও অন্যদিকে সুখের বার্তাবাহক। এই দুই কিশোরীর সাথে যেদিন থেকে আমি পরিচিত হয়েছি, তাদের মাঝে বিশেষ মাত্রার ঈমান ও তাকওয়ার উন্মেষ দেখেছি। তাদের চোখে-মুখে আল্লাহর বড়ত্বের ঘোরলাগা উদ্ভাস দেখেছি। তাদের কোমল হৃদয়গুলোকে সবসময় আল্লাহর ভালোবাসা ও ভয়ের সুকুমারবৃত্তিতে ভরাট পেয়েছি।

আল্লাহ চাহেন তো, বইটি অনেক মানুষের হিদায়াতের মাধ্যম হবে। এখনো যারা অন্ধকার জগতের গলি-ঘুপচিতে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা নিঃসন্দেহে এ বইয়ের মাঝে ঈমানের আলোকিত আঙিনায় প্রবেশের অনুপ্রেরণা পাবেন।

সবশেষে আমি বিশ্বের সকল মুসলিমের কাছে এ অনুরোধ করব—

'হে জনগণ, হে মাদরাসা ও মসজিদের সেবকগণ, হে সফেদ হৃদয়ের অধিবাসীগণ, হে দ্বীনের প্রহরীগণ, একটু মাথা তুলে তাকিয়ে দেখুন—আয়িশা আর মারইয়ামের মতো হাজারো কোমল কিশোরী কুফরের জঞ্জাল থেকে বেরিয়ে ইসলামে প্রবেশ করতে উদগ্রীব হয়ে আছে; কিন্তু বাতিল ও গোমরাহ শক্তিগুলো তাদের ও ইসলামের মাঝখানে আড়াল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আপনারা এগিয়ে এসে সেই আড়াল উচ্ছেদ করে তাদের হাত ধরুন। আপনার একটুখানি উদ্যোগ তাদের জাহান্নামি জীবনের সমাপ্তি টেনে আনবে, ইন শা আল্লাহ।'

মহান আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু কবুল করুন। নাজাতের মাধ্যম বানিয়ে দিন। আমিন।

দুআপ্রার্থী

বিনতু আদিল

Scanned with CamScanner

ফেরা

রাত্রির শেষ প্রহর। সাত আসমানের অধিপতি নেমে এসেছেন প্রথম আসমানে। বান্দাদের ডাকছেন—

আছে কি কোনো তাওবাকারী, যার তাওবা আমি কবুল করব?

আছে কি কোনো ক্ষমাপ্রার্থনাকারী, যাকে আমি ক্ষমা করে দেবো?

কেউ কি কিছু চাইছে আমার কাছে, যাকে আমি দান করব?

ঠিক এই সময়, একদম এই সময়েই আলো জ্বলে ওঠে বিন্নুরি গার্লস মাদরাসার ২০৩ নম্বর কক্ষে।

'মারইয়াম, উঠে পড়ো! তাহাজ্জুদের সময় হয়ে গেছে। আনুশিয়া, রুকাইয়া ওঠো! তাহাজ্জুদ পড়বে না?'

যে মেয়েটা একে একে সবাইকে ডাকছে তার নাম আয়িশা। নওমুসলিম সে। দিন পনেরো হলো মাদরাসায় এসেছে। সঙ্গে এসেছে তার ছোট বোন মারইয়াম।

রাত্রির শেষ প্রহরে নিয়ম করে ঘুম ভেঙে যায় আয়িশার। দু-চারটা সুরা মুখস্থ হয়েছে সবে। ওটুকু সম্বল করেই আবেগমথিত হৃদয়ে রবের সামনে দাঁড়ায় সে। পার্থিব কোলাহলকে পেছনে ফেলে সে মগ্ন থাকে নিবিড় আলাপনে, সুমহান রবের সাথে।

Scanned with CamScanner

কেমন করে এ জীবনে এলো আয়িশা? কেনই-বা মারইয়াম তার সঙ্গী হলো? তাদের তো জন্ম হয়েছিল এক হিন্দু পরিবারে। তারা তো বেড়ে উঠেছিল এক ক্ষয়িষ্ণু সমাজে—এমন এক সমাজে, যেখানে সব ধর্মের অস্তিত্ব মিলেমিশে একাকার। মুসলিমরা হোলি খেলছে, সাড়ম্বরে অংশ নিচ্ছে বসন্তপূজায়। হিন্দুরাও অভ্যস্ত মুসলিমদের জীবনাচারে। অজ্ঞতা আর মূর্খতায় ঘেরা জীবন। কেউ জানে না কোথায় যাচ্ছে, কীসের পিছনে ছুটছে সবাই!

তবুও তো এমন হয়—প্রচণ্ড ঝড়ে লণ্ডভণ্ড অস্থির প্রকৃতিতে প্রাণের জোয়ার আসে। জ্বলে ওঠে জীবনের প্রদীপ। দমকা বাতাসও সে প্রদীপ নিভিয়ে দিতে পারে না। এমনই দুটি প্রদীপের নাম আয়িশা আর মারইয়াম। কী করে জ্বলে উঠল তারা? শোনা যাক আয়িশার জবানিতে।

আমাদের পরিবার

'বাবা মুসলিম, মা হিন্দু আর মেয়ে হয়েছে আধা খ্রিস্টান—তামাশার শেষ নেই সংসারে!'

মায়ের চিৎকার আমাদের রুম থেকেও দিব্যি শোনা যাচ্ছে। নীলমের সাথে চোখাচোখি হলো আমার। ইশারায় বলে দিলাম রুমের দরজাটা যেন লাগিয়ে দেয়। তাতে যদি আওয়াজ কিছুটা কমে! খুব একটা লাভ হয়নি অবশ্য। প্রতি রাতে নিয়ম করে মায়ের আহাজারি শুরু হয়। রাত যত বাড়ে, তার চিৎকারও বাড়ে। খাবার টেবিল গুছাতে গুছাতে মা একবার না একবার এসব কথা তুলবেনই। বাবার অসহায় ম্রিয়মাণ গলা ঢাকা পড়ে যায় বাসন-কোসনের ঝনঝনানিতে।

মায়ের চ্যাঁচামেচির কোনো সমাধান নেই আসলে। মনের ঝাল মেটাতে সুযোগ পেলেই তিনি চিৎকার করেন। বাবা তার মুসলিম কর্মচারীর পাল্লায় পড়েছেন। ভদ্রলোক ভীষণ ধার্মিক, সজ্জন ব্যক্তি। দাড়ি আছে, ধর্মকর্ম করেন বেশ নিষ্ঠার সাথে। সম্প্রতি বাবাকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে বসেছেন। এখানেই ব্যাপারটা শেষ হলে চিন্তার কিছু ছিল না। চিন্তার বিষয় হলো বাবা তার দাওয়াত কবুল করে নিয়েছেন।

আমাদের পরিবারে, মায়ের ভাষায় 'তামাশার সংসারে' এমন খবরটা সহজভাবে নেওয়ার অবকাশ নেই। মা আমার মনেপ্রাণে হিন্দু। স্বামী মুসলিম হয়ে যাবেন—এটা মেনে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব না। যদিও আমরা থাকি মিশ্র এক পরিবেশে, তবুও। মিলেমিশে সব ধর্মের রীতিনীতি এক-আধটু পালন করা আর একেবারে ধর্মান্তরিত

Scanned with CamScanner

হয়ে যাওয়াতে তফাত আছে। আত্মীয়-স্বজন মানবে না, সমাজও একঘরে করে দেবে। আর আমার মা-ও এই তফাত মানতে পারছেন না কোনোভাবেই। এজন্যই রোজ রোজ হট্টগোল।

আমাদের বর্তমান নিবাস মিরপুরখাস জেলার এক ভাড়া বাড়িতে। পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের একদম সীমান্তঘেঁষা জেলা এই মিরপুরখাস। সীমান্তবর্তী বলেই এখানে হিন্দু-মুসলিমের সংখ্যা প্রায় কাছাকাছি। ধর্ম নিয়ে খুব বেশি চিন্তা-ভাবনা নেই এখানকার মানুষের। এক ধর্মের লোকেরা আরেক ধর্মের প্রথা দিব্যি মেনে চলেছে। মুসলিমরা রাখি বন্ধনের অনুষ্ঠান করছে তো হিন্দুরা ঝাড়-ফুঁকের জন্য দৌড়াচ্ছে মসজিদে। আমার বড় দুই ভাইয়ের কথাই ধরা যাক। তারা রামাদানে সিয়াম রাখে, সাহরি খায়। ফজরের সালাত আদায় করে। অন্য চার ওয়াক্ত সালাতেও তাদের দেখা যায় কদাচিৎ। তাদের কথা, 'হিন্দু বলো আর মুসলিম, আমাদের সবার প্রভু তো একজনই।'

বাবা আগে রাগ করতেন ভাইদের সালাত পড়তে দেখলে। এখন তিনি নিজেই মুসলিম হয়ে যেতে চাইছেন। অবশ্য মায়ের চ্যাঁচামেচিতে তার মুসলিম হবার খায়েশ ইতোমধ্যে ধামাচাপা পড়ে গেছে। ধামাচাপা পড়ে গেছে মেজো দিদির খ্রিষ্টান হবার শখও। কীজন্য সে খ্রিষ্টধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল ঠিক মনে নেই। তবে মা-বাবা তা হতে দেননি। মেজো দিদি লক্ষ্মীর বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন তড়িঘড়ি করে।

আমরা সাত ভাই-বোন। বড় দিদি আর মেজো দিদি থাকে যার যার শ্বশুরবাড়িতে। বড় দুই ভাইয়ের ছোটখাটো যৌথ ব্যবসা আছে। ব্যবসা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত তারা। বাবার মতোই দশ-পনেরো দিন পরপর বাড়ি আসে। ভাইদের পর আমি, আমার ছোটবোন নীলম আর সবচে ছোট এক ভাই।

বড় ভাইদের মতো বাবারও নিজস্ব ব্যবসা। মিরপুরখাসে আসার আগে আমরা থাকতাম পাশের জেলা সংহারে। বাবার ব্যবসায় লোকসান হলো, তল্পিতল্পা গুটিয়ে আমরা পাড়ি জমালাম মিরপুরখাসে। দুই জেলার সংস্কৃতিতে খুব একটা পার্থক্য ছিল না। তাই মানিয়ে নিতে সমস্যা হয়নি তেমন। মিশ্র ধর্মীয় সংস্কৃতি এখানে। যার ছাপ আমাদের পরিবারেও বেশ ভালোমতোই পড়েছে—মা ধর্মপ্রাণ হিন্দু, বাবা আর দিদি মায়ের কাছে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছে হিন্দুধর্মে, আর ভাইয়েরা নিজেদের মতো করে কখনো ইসলাম, কখনো হিন্দুধর্মের রীতিতে গা ভাসাচ্ছে।

Scanned with CamScanner

এসময়টা আমার মনে হতো পরিবারে মা বাদে বাকিরা বুঝি ইসলামের ব্যাপারে বেশ সহনশীল। সময়ের সাথে সাথে আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। সবার অনুরাগ ফিকে হয়ে আসতে দেখলাম নিজ চোখে। আর ইসলামকে ভালোবেসে ফেললাম আমি—যার কিনা ধর্ম নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না বললেই চলে। জানি না কোন সময়ে আমার হৃদয়ে ঈমানের ফুল ফুটেছিল।

শুরু হলো নতুন জীবন। নিস্তরঙ্গা, নির্বিবাদী জীবন ফেলে ঝাঁপ দিলাম এক অজানা গন্তব্যে। আমার সঙ্গী হলো নীলম। মনিকা থেকে আমি হলাম আয়িশা আর নীলম হলো মারইয়াম।

নিরাপত্তার বলয়ে

মেট্রিক পর্যন্ত ধর্ম নিয়ে আমার চিন্তা-ভাবনা বেশ সাদামাটা ছিল। বাবা-মা যে ধর্ম মানেন, আমরাও সেই ধর্ম মেনে চলি। সেই ধর্ম আসলে কতটা যৌক্তিক? সেটা কি সত্য ধর্ম, না মিথ্যা ধর্ম—এসব বিষয় তখনো আমাদের চিন্তায় আসেনি। আমরা তখন ভাবতাম, আমাদের বড়রা হিন্দু; তাই আমরাও হিন্দু। সহজ কথায়, ধর্মের ব্যাপারে তখনো আমরা ছিলাম খুবই সীমাবদ্ধ চিন্তার মানুষ। তবে এই সীমাবদ্ধতার মাঝেও কেন জানি পর্দা করতাম আমি। মাথা ঢেকে রাখতাম মুসলিম মেয়েদের মতো। এর মধ্যে অন্যরকম স্বস্তি আর নিরাপত্তা অনুভব করতাম, পর্দাকে মনে করতাম নিজের সম্ভ্রম আর শালীনতার অংশ।

কেন আমি হিন্দু হয়েও পর্দার বিধানকে এত আপন করে নিয়েছিলাম? এখন মনে হয়, আমি তখন এক পাহাড়ের আড়ালে ছিলাম। সেখানে সূর্যের আলো আসা বারণ। একদিন পাহাড়ের ওপাশ থেকে সূর্যের আলো এসে পৌঁছল, জেগে উঠল আমার সমগ্র সত্তা। পর্দা ছিল সে আলোর প্রথম কিরণ।

ঘরের লোকেরা পর্দার ব্যাপারটি সহজভাবে নিতে পারত না। এ নিয়ে সব সময় মা আর ভাইদের সাথে আমার তর্ক লেগেই থাকত। তারা আপত্তি করত, আমি হিন্দু ঘরের মেয়ে হয়েও কেন মাথা ঢেকে রাখি?

কেন পুরো শরীর-ঢাকা পোশাক পরি?

কেন আর সবার মতো করে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মিশি না?

Scanned with CamScanner

চুলটা কি একটু খোলা রাখা যায় না?

কতশত প্রশ্ন! আমিও চুপ করে থাকতাম না। পালটা যুক্তি দিতাম, 'আমি খোলা চুলে শরীর দেখিয়ে বাইরে যাই, আর বখাটেরা আমার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাক! তখন খুব ভালো লাগবে তোমাদের, তাই না? আত্মসম্মানবোধে একটুও ঘা লাগবে না? তোমরাই না আমার সম্ভ্রমের রক্ষাকবচ হবে! অথচ তোমাদেরই উলটো হাল! সম্মানের সাথে শালীন পোশাকে বের হলে কেন কুণ্ঠাবোধ করো তোমরা?'

ভাইদের আত্মসম্মানে আঘাত দিতে চাইতাম এসব বলে। ধিক্কার দিতাম ভাতৃত্বের দোহাই দিয়ে। তবু তারা মানতে চাইত না। তাদের ভয়—এভাবে চললে আমার কোনো বিয়ের সম্বন্ধ আসবে না। এমন পর্দানশিন হিন্দু মেয়েকে কে বিয়ে করবে!

অবশ্য মা-ভাইদের আশঙ্কা সত্ত্বেও বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল! তখন পূজা দিতে মন্দিরে যেতাম নিয়মিত। এই যাতায়াতের সূত্র ধরেই প্রস্তাব আসে। বাবা-মা আর ভাইবোনদের বেশ মনঃপূত হয় সে প্রস্তাব। তারা সবাই 'হ্যাঁ' জানিয়ে দেয়। কেবল বাধ সেধেছিলাম আমি। বাবাকে বলেছিলাম, 'আমি এখনো অনেক ছোট। এ মুহূর্তে বিয়ে-সংসারের প্রতি মোটেও আগ্রহ নেই। বাবা, এই বিয়ের প্রস্তাবটা তুমি ফিরিয়ে দাও প্লিজ!'

বাবা আমাকে ভীষণ ভালোবাসতেন। আদুরে মেয়ের অনুরোধ ফেলতে পারেননি তিনি। মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, 'ঠিক আছে মা, আসলেই তুই অনেক ছোট। তুই যা বলবি, আমি তা-ই করব। কলেজে ভর্তি হয়ে নে। আমি এখনই ছেলেপক্ষকে 'না' করে দিচ্ছি।'

এই ঘটনার পর থেকে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছিলাম আমি। কেন যেন মনে হতো, আমার চারপাশটা একটা অদৃশ্য নিরাপত্তার বলয়ে ঘেরা। এই বলয় আমাকে বারে বারে ফিরিয়ে আনে মন্দকাজ থেকে।

বাবার অসন্তোষ

বাবার ব্যাবসায়িক পার্টনার ছিলেন মুসলিম। বাহ্যিকভাবে তাকে বেশ ধর্ম অনুরাগীই মনে হতো। আফসোস! অল্প কদিনের মাথায় বাবার সাথে ব্যাবসায়িক প্রতারণা করে বসেন তিনি।

Scanned with CamScanner

একবার আমাদের ঘরের সমস্ত মালামাল চুরি হয়ে যায়। আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হই আমরা। আশ্চর্যের বিষয়—কিছুদিন পর চুরি যাওয়া সব মালামাল দেখা গেল সেই লোকের কাছে। বিক্রি করবেন বলে গদিতে তুলেছেন। এ দৃশ্য দেখে বাবার মন ভেঙে যায়। গোটা মুসলিম জাতির ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন তিনি। তার বদ্ধমূল ধারণা হয়ে যায়, মুসলিমরা কখনোই সত্যবাদী হয় না। কোনো অবস্থায়ই কোনো মুসলিমের ওপর ভরসা করবেন না তিনি।

এই ঘটনার পর বাবা প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ঘরের জিনিসপত্র বিক্রি করে তার চিকিৎসা করা হয়। তার অসহায়ত্বের সেই দিনগুলোর কথা কখনোই ভুলব না আমি। তখন আমার দিনের বড় একটা অংশ কেটে যেত স্টোর রুমে। পূজার জন্য সেখানে একটা ছোট্ট মন্দির বানিয়েছিলাম। ভগবানের মূর্তি রাখা ছিল রুমের ঠিক মাঝখানটায়। ঘরের লোকজন ওই মূর্তিকে পূজা দিত প্রতিদিন। স্থানীয় বড় মন্দিরটা ছিল আমাদের ঘর থেকে বেশ দূরে। প্রতিদিন সেখানে গিয়ে পূজা দেওয়া দুরূহ ব্যাপার। তাই ঘরের লোকেরা যে যার সুযোগমতো এখানে এসে পূজা করে যেত। এ ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ঘরোয়া চাপ ছিল না। আমাদের কাছে জীবনের অর্থ ছিল উপার্জন আর আহার-বিহার। আর ধর্ম ছিল পারিবারিক প্রথা মাত্র। স্টোর রুমে গিয়ে আমি ভগবানের মূর্তির কাছে বাবার সুস্থতা কামনা করতাম—আমার উপাসনা বলতে এতটুকুই।

অনুভূতির উৎস

মিরপুরখাসে আমাদের বাড়ির সাথে লাগোয়া বেশ কয়েকটা হিন্দু আত্মীয়-বাড়ি ছিল। আর গলির অপর পাশে ছিল মুসলিম পরিবারের বসবাস। আমরা মিলেমিশে থাকতাম। পরস্পরের মাঝে যাতায়াতও ছিল বেশ।

তবে সেখানে একটা পরিবার ছিল একটু আলাদা। দ্বীনদার পাঠান পরিবার। কঠোর পর্দা-পুশিদায় চলত তারা। এ জন্য তাদের বাড়িতে যাতায়াত কম হতো। বড়জোর দেখা-সাক্ষাতে কুশল বিনিময়। বাড়ির বয়স্ক মহিলাটিকে আমরা 'আন্টি' বলে ডাকতাম। আমাকে দেখলে খুবই খুশি হতেন তিনি।

সমবয়সি এক মুসলিম মেয়ের সাথেও বন্ধুত্ব ছিল আমার। সে আমাদের বাড়িতে আসত, আমিও যেতাম তাদের বাড়িতে। আমাদের বাড়ির মালিক থাকতেন নিচতলায়। তিনিও বেশ ধার্মিক মুসলিম ছিলেন। নিয়মিত তার সাথে কথাবার্তা হতো আমার।

Scanned with CamScanner

বলা চলে আমাদের চারপাশটা মুসলিম পরিবার দিয়ে ঘেরা ছিল। তারপরও কী অদ্ভুত ব্যাপার—তাদের কেউ কোনোদিন আমাকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়নি। দীর্ঘ নয় বছর তাদের আশেপাশেই ছিলাম আমি। ভেবে অবাক হই, কী করে তারা দাওয়াত না দিয়ে থাকতে পারল এতগুলো বছর!

আমাদের আশেপাশে কখনো মুহাররমের জলসা হতো। কখনো মিলাদ হতো। কখনো আবার কুরআনের আসর। আমি খুব শখ করে এ ধরনের অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণ করতাম। মুসলিম মেয়েদের মতো মাথায় ওড়না দিয়ে চলাফেরা করতাম, ভালো লাগত ভীষণ। অবশ্য এ ভালো লাগার জন্য পরিবার আর ধর্মের বিরুদ্ধে যেতে হতো আমাকে।

একদিনের কথা। পাশের এক মুসলিম পরিবারে কুরআনের আসর হচ্ছিল। ওই পরিবারের সমবয়সি মেয়েটা আমার বান্ধবী। সেই সূত্র ধরে আমি তাদের বাসায় হাজির হই। সেখানে পরিচয় হয় আনআমের সাথে। প্রথম দেখাতেই ভালো লেগে যায় ওকে। উচ্ছল-প্রাণবন্ত একটা মেয়ে, যাকে দেখলেই মনে হয় একটু পরিচিত হই, একটু কথা বলি।

সেদিন বিদায়ের মুহূর্তে আমরা একে অপরকে নিজেদের বাসায় দাওয়াত দিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম, 'প্রথমে তুমি আমাদের বাসায় এসো। এরপর আমি তোমাদের বাসায় যাব।'

আনআমের কথা খুব মনে পড়ে। মেয়েটা খুবই ভালো। একেবারে কোমল স্বভাবের। সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসে। ওর প্রতিটি কথায় ছিল পবিত্রতার ছোঁয়া। ইশ, ওর সাথে যদি আবার দেখা হতো!

আনআম আমার ঘরে

সকাল থেকে আদা-জল খেয়ে ঘর ধোয়ামোছার কাজ করছিলাম। কোনো উপলক্ষ্য ছিল না, মাঝে মাঝে ঘর গোছাতে বেশ লাগে। কাজ শেষে পুরো ঘরে চোখ বুলাতে কী যে অপার্থিব আনন্দ! এই আনন্দ অন্য কিছুতে পাওয়া যায় না। সব গুছিয়ে যখন ঘরের দিকে তাকালাম, মনে হচ্ছিল, প্রতিটি কোণে আলো ঝলমল করছে। ওদিকে আমার আকস্মিক 'শুদ্ধি-অভিযান' দেখে বাসার সবাই ধরে নিয়েছে কাউকে বুঝি আজ দাওয়াত করেছি।

Scanned with CamScanner

এরই মধ্যে হঠাৎ কলিং বেল বেজে উঠল। ভাবলাম, হয়তো কোনো আত্মীয় এসেছে, কিংবা বাবা। দ্রুত পায়ে ছুটে গেলাম দরজায়। দরজার ফুটো দিয়ে তাকিয়ে দেখি হিজাব পরা একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হিজাব পরে আবার কে এলো এই অসময়ে? ছিটকিনিটা খুলে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'কেমন আছ মনিকা?'

আরে! এ কণ্ঠ তো আমার চেনা! একে তো আমি চিনি! কবে থেকেই তার সাক্ষাতের অপেক্ষায়—

'আনআম নাকি!'

'হ্যাঁ, আমিই। আজ সত্যি সত্যিই চলে এলাম। কী বিশ্বাস হচ্ছে না? আরে, ঢুকতে দেবে না বুঝি? পথ থেকে সরে দাঁড়াবে তো!'

খানিক অপ্রস্তুত হয়ে সরে দাঁড়ালাম আমি। ভাবতেই পারিনি এত দ্রুত আমার ইচ্ছে পূরণ হবে। ভেতরে নিজের রুমে বসালাম ওকে।

'এ কদিন একবারও ভেবেছিলে আমার কথা?'

'আর বোলো না, তুমি ভাবতেও পারবে না কতটা অবাক হয়েছি আমি! সেদিনও ভাবছিলাম, ইশ, তোমার সাথে যদি আবার দেখা হতো! আমার হাহাকার তো দেখছি তোমার কাছে ঠিক ঠিক পৌঁছে গেছে!'

'মনিকা, সত্যি বলছি, তোমার হাহাকারই আজ আমাকে এখানে টেনে এনেছে। নইলে আজ আমার এখানে আসবার কথা ছিল না।'

প্রশ্নের মুখোমুখি

আমার সাজানো-গোছানো রুম আনআমের চোখে পড়েছে। বায়না ধরেছে—পুরো বাড়িটা ঘুরে দেখবে। এই বায়নায় আমি খানিকটা আহ্লাদিতই হলাম। একটু আগেই যে ঘর-দুয়ার ঝেড়ে-মুছে ঝকঝকে-তকতকে করে রেখেছি! ওকে এখন একটা পরিষ্কার-পরিপাটি বাড়ি দেখাতে পারব। তাই কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ রুমের বাইরে নিয়ে এলাম ওকে। ঘুরে দেখাতে লাগলাম পুরো বাড়ি। একে একে সব রুম দেখিয়ে শেষে নিয়ে এলাম আমাদের ছোট্ট মন্দিরে—স্টোর রুমে। কে ভেবেছিল,

Scanned with CamScanner

আনআমের বায়না হিদায়াতের আলোকবর্তিকা হয়ে হেসে উঠবে আমার জীবনে!

স্টোর রুমের দুয়ারে পা রাখতেই আনআম বড় বড় চোখ করে মূর্তিগুলো দেখতে লাগল। এরপর একবার মূর্তির দিকে, আরেকবার আমার দিকে চোখ নিবদ্ধ করে জিজ্ঞেস করল—

'মনিকা, এগুলো কী?'

'আমাদের ভগবান।'

'এখানকার সবগুলোই কি তোমাদের ভগবান?'

'হ্যাঁ, সবগুলোই।'

'তুমি কার উপাসনা করো?'

'কেন? আমার ভগবানদের।'

উত্তর শুনে আনআম যেন হোঁচট খেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম—

'কেন? কী হয়েছে?'

'না, এমনি। তবে একটা প্রশ্ন, এই মূর্তিগুলো কি হাতের তৈরি?'

'হ্যাঁ, মাটি আর খড়ের তৈরি। বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।'

'সে তো বুঝলাম। এবার বলো, এগুলো কি কোনো মানুষের বানানো?'

'কী আশ্চর্য! হাতে তৈরি মূর্তি মানুষ ছাড়া আর কে বানাবে, বলো?'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছ, মূর্তিগুলো মানুষের হাতের তৈরি? তাহলে তো এসব একেবারেই পরনির্ভরশীল। মানুষ এগুলো মাটি আর খড় দিয়ে তৈরি করে। এরপরও তোমরা এসবের উপাসনা করো!'

আনআমের কণ্ঠে বিস্ময়। আমার দিকে তাকিয়ে আছে অবাক নয়নে। যেন শুনতে চায়—কেন এই পরনির্ভরশীল মূর্তির উপাসনা করি। কথা বলার শক্তি পাচ্ছি না আমি। ওর থেকে দৃষ্টি নামিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। আমাকে চুপ থাকতে দেখে আনআম নিজেই বলতে শুরু করে, 'মনিকা, একটা ব্যাপার ভেবে দেখেছ? মূর্তিগুলো নিজেরাই যখন মানুষের ওপর নির্ভরশীল, তখন কীভাবে এরা মানুষের উপকার করবে? কীভাবে মানুষের বিপদে সাহায্য করবে, প্রয়োজনে পাশে দাঁড়াবে? কীভাবেই-বা দান

Scanned with CamScanner

করবে দুহাত খুলে? আচ্ছা, তোমরা এগুলোর কাছে এ যাবৎ যা কিছু চেয়েছ, এরা কি কখনো দিতে পেরেছে সেসব?'

'অবশ্যই। আমরা তাদের কাছে চাইলে, তারা আমাদের দান করেন। বিপদে সাহায্য করেন।'

আনআম তখন ফিক করে হেসে বলল, 'যে মহান সত্তা আমাদের দান করেন, তিনি এইসব পরনির্ভরশীল বস্তু থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। তুমি-আমি-সহ পুরো বিশ্বভূমণ্ডল সেই সত্তার মুখাপেক্ষী। এই মাটির তৈরি পরনির্ভরশীল বস্তুগুলো আমাদের কী আর দেবে!'

আনআম যখন কথাগুলো বলছিল, তার চোখে আমি আলোর ঝলকানি দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল আলোর স্রোত ওর চোখ থেকে আমার চোখ বেয়ে পুরো শরীরে বয়ে যাচ্ছে। সে আলোর পরশ অনুভব করতেই বুকের ভেতর তীব্র ধকধকানি শুরু হলো। একেবারে শূন্য মনে হতে লাগল মাথাটা। কোনোমতে নিজেকে সামলে নিলাম। ওকে সাথে করে বেরিয়ে এলাম স্টোর রুম থেকে।

গল্পে গল্পে একসময় আনআম বাসায় ফেরার কথা বলল। বিদায় জানাতে খুব কষ্ট হচ্ছিল আমার। যাওয়ার সময় ও আরেকবার বলে গেল, 'মনিকা, আমার কথাগুলো একটু ভেবে দেখো। আল্লাহ হাফিয।'

আলোড়ন

আনআমকে বিদায় দিয়ে খাটের ওপর বসে পড়লাম। হাত-পা কাঁপছিল রীতিমতো। যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে আমার ওপর। জীবন নিয়ে হিসাব কষতে বসলাম, ঠিক যেমন ভূমিকম্পের শেষে মানুষ ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব করে। কতটা দিন পেরিয়ে গেছে বেহিসাবে, বেখেয়ালে। অনেক দেরি হয়ে গেছে, অনেক! আজ আনআম আমার হৃদয়-জমিন কাঁপিয়ে দিয়ে গেছে। কী করলাম এতটা দিন? কী পেয়েছি এই দিনগুলোতে? হারিয়েছিই-বা কী? এই মুহূর্তে আমার ঠিক কী করা দরকার? কেন নিরন্তর আমার হাত-পা কেঁপে চলেছে? কী হচ্ছে আমার সাথে?

সন্ধ্যায় যখন স্টোর রুমে এলাম, তখন নিজেকে অচেনা-অচেনা মনে হচ্ছিল। ভগবানের মূর্তিগুলো ছুঁয়ে দেখলাম—মাটির তৈরি নির্জীব মূর্তি। এতদিন এরই পূজো দিয়ে এসেছি। এগুলো যদি ভগবানই হয়ে থাকে, তাহলে কেন এরা আমাদের মুখাপেক্ষী?

Scanned with CamScanner

বিজ্ঞানের বইয়ে পড়েছি, মাটির মাঝে যে-সকল উপাদান রয়েছে, মানুষের মাঝেও ঠিক সেই উপাদানগুলো রয়েছে। তার মানে, আমি নিজেও মাটির তৈরি। তাহলে আমি কে? এরা কারা? প্রশ্নের ঝড় উঠেছে মনে—এগুলো কি আসলেই আমাদের ভগবান? আমরাই তো এগুলো মাটি দিয়ে তৈরি করেছি। আবার আমরাও মাটির তৈরি। সৃষ্টি আর স্রষ্টা কি একই উপাদানে গড়া হতে পারে? যদি না হয়, তবে আমাদের স্রষ্টা কে? কে আমাদের সৃষ্টি করেছেন?

চিন্তা করেও কোনো কূলকিনারা পাচ্ছি না। প্রচণ্ড অসহায় আমি! কষ্টের তীব্রতা চোখ বেয়ে অশ্রু হয়ে ঝরছে। সে অশ্রুর ফোঁটাগুলো ভিজিয়ে দিল ভগবানদের—মাটির তৈরি মুখাপেক্ষী ভগবানদের। স্টোর রুমের সমস্ত ভগবান ক্রমশ ঝাপসা হতে শুরু করেছে। অশ্রুবারি পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছে আমার চোখের সামনে।

বুঝতে পারছি না কিছুতেই—আমাদের পিতৃপুরুষ এই অসহায় ভগবানগুলোর উপাসনা করেছেন বলে আমাদেরও সেগুলোর উপাসনা করতে হবে? এভাবে না বুঝেই দিনের পর দিন তাদের অন্ধ অনুকরণ করে যেতে হবে? এগুলো নাকের ডগায় বসা একটা মাছিও তাড়াতে পারে না জেনেও!

আনআম আমার রুমে ফিরে এসে বলেছিল, 'মনিকা, বাইরে তাকিয়ে দেখো, কী সুন্দর প্রকৃতি। দিগন্ত-বিস্তৃত নীল আকাশ। রাতের আকাশে জ্বলজ্বলে বিশাল চাঁদ, শত শত নক্ষত্র। রহস্যভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে একবার নিজেকে জিজ্ঞেস করো তো, এগুলো কি কোনো মূর্তির তৈরি? বিজ্ঞানের বইতে রহস্যময় সমুদ্র সম্পর্কে কত তথ্যই তো পড়েছি আমরা। তোমার কি মনে হয়, তোমার স্টোর রুমের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে পড়ে থাকা ভগবানগুলো এই সমুদ্র আর মহাসমুদ্র সৃষ্টি করেছে? কথাগুলো ভেবে দেখো কিন্তু।'

সেই রাতে

শত চেষ্টা করেও দুচোখের পাতা এক করতে পারলাম না। পেছনের জীবন নিয়ে মনের অলিন্দে হাজারো প্রশ্ন দানা বেঁধে উঠতে লাগল। দোটানায় পড়ে এপাশ-ওপাশ গড়াগড়ি করেই নির্ঘুম রাত কেটে যাচ্ছিল। জীবনে এই প্রথম নিজেকে মূল্যহীন মনে হচ্ছিল খুব।

Scanned with CamScanner

রাতের শেষ প্রহরে হঠাৎ মনে হলো আমার সমস্ত অস্থিরতা কেটে যাচ্ছে। মনে হলো, এখন, এই মুহূর্তে আমার কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু ঠিক কী করা দরকার—তা জানি না। এখানে এই গভীর রাতে কে আমাকে বোঝাবে! কে আমাকে শেখাবে! কে আমাকে সঠিক পথ বাতলে দেবে!

বিছানা থেকে উঠে জানালার পাশে এসে দাঁড়ালাম। এখান থেকে রাস্তার অনেকটা দেখা যায়। বাইরে অন্ধকার। সামান্য দূরে একশো ওয়াটের একটা বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে। সে বাতির আলোয় মসজিদের আবছা অবয়ব দেখতে পাচ্ছি। বিমোহিত দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম মসজিদের দিকে। আগেও অনেকবার এমন হয়েছে। কিন্তু আজ কেন যেন আমার দৃষ্টি আটকে গেল মসজিদের আলোকিত মিনারে। কেমন যেন একটা শীতল শিহরন বয়ে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। মনে হলো, মসজিদের মিনার থেকে এক টুকরো আলো ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। আচ্ছা, মিনারের এই আলো কি আমাকে কোনো কিছুর দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে? আগে কি কখনো দেখেছি এই আলো?

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে মসজিদের মিনার থেকে ভেসে এলো 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি। ফজরের আযান। পুরো শরীরে প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়ল যেন। এতক্ষণ যে অদৃশ্য বোঝার চাপে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল, মনে হলো, এখন সেই বোঝা হালকা হয়ে এসেছে। দেহ-মন একেবারে নির্ভার হয়ে গেছে। সর্বসত্তায় ফিরে এসেছে সতেজতা আর প্রাণোচ্ছলতা।

আযান শেষ হওয়ার পরও অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম আনমনে। এরপর ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। ঘুম ভাঙল সকাল দশটায়, ছোট বোন নীলমের অবিরাম ডাকাডাকির পর। আজ যেন নিজেকে একটু বেশিই সতেজ মনে হচ্ছে।

এ মুহূর্তে আনআমের সাথে কথা বলা দরকার আমার। মোবাইল তুলে নিয়ে ফোন করলাম। ওপাশ থেকে আনআমই কথা বলা শুরু করল। যেন ও এতক্ষণ আমার ফোনের অপেক্ষায়ই ছিল।

'আস সালামু আলাইকুম। কে বলছেন?'

'ওয়া লাইকুমুস সালাম। আমি মনিকা।'

'আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবি করুন। আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম, জানো?'

Scanned with CamScanner

'আনআম, তোমার কালকের কথাগুলো প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছে আমাকে। এ বিষয়ে আরও জানতে চাই। আমার মনে হচ্ছে, আমি এত দিন এই কথাগুলোই শোনার অপেক্ষায় ছিলাম।'

'মনিকা, আমি কিন্তু কালকের কথাগুলো তোমাকে হুটহাট বলিনি। তোমার সাথে যেদিন আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেদিনই অনুভব করেছিলাম, তোমার ভেতরে একটা অনুসন্ধিৎসু মন রয়েছে। সে তোমাকে অস্ফুট আওয়াজে বলতে চাইছে, আল্লাহ তোমাকে পৃথিবীতে লক্ষ্যহীন করে পাঠাননি। তোমার এই অনুসন্ধানী মনই তোমাকে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তোমাকে দিয়ে পৃথিবীতে কাজ করিয়ে নিতে চান। তবে কী কাজ, সেটা সময়ই বলে দেবে। অদৃশ্যের সংবাদ শুধু আল্লাহই জানেন। সব খবরাখবর শুধু তাঁর কাছেই থাকে। এ কারণেই আমি কাল তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম, মূর্তির পায়ে মাথা ঠুকলে মূর্তিও ভেঙে যাবে, তোমার মাথাও আহত হবে; কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হবে না। একটু ভেবে দেখো তো, আল্লাহ আমাদের বিবেক-বুদ্ধি কেন দিয়েছেন? মন-মস্তিষ্ক কেন দান করেছেন? আল্লাহ কেন আমাদের জন্তু-জানোয়ারের মতো বিবেকহীন করে সৃষ্টি করেননি? কেন পশুদের সব অপরাধ মাফ করে দিয়েছেন? কেন আমাদের পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্বের মাঝে ঝুলিয়ে রেখেছেন? আর কেনই-বা আমাদের পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছেন?'

এক নাগাড়ে বলে যাচ্ছে আনআম। এ কথাগুলো ভাবার জন্যই আল্লাহ আমাদের মন-মস্তিষ্ক দিয়েছেন। যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তা দান করেছেন। এরপরও কেন আমরা হাতের তৈরি মূর্তির পদতলে মাথা ঠুকব? আল্লাহ আমাদের দীর্ঘ অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। যারা আল্লাহর প্রকৃত বান্দা, তারা এই সুযোগ গ্রহণ করে ফিরে আসে তাঁরই দিকে। আর যারা শয়তানের অনুচর, তারা শয়তানের কাছেই প্রত্যাবর্তন করে। আল্লাহ শয়তানকেও লম্বা অবকাশ দিয়েছিলেন। কিন্তু শয়তান সেই অবকাশ কাজে লাগায়নি। বরং কেউ যেন অবকাশ কাজে লাগাতে না পারে—সে জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। সুতরাং, শয়তানের ব্যাপারে আমাদের সাবধান থাকতে হবে কাজে লাগাতে হবে আল্লাহর দেওয়া সমস্ত সুযোগ।'

জানি না, আনআম আমার সাথে কথা বলছিল, নাকি জীবনের সঞ্জীবনী সুধা পান করাচ্ছিল। এমন কথা আমি আগে কখনো শুনিনি। অথচ শোনার জন্য কী তৃষিতই-না ছিলাম!

Scanned with CamScanner

ঘরের প্রতিটা সদস্যকে অচেনা লাগছিল সে-মুহূর্তে। আমি যেন সুমহান স্রষ্টাকে ছাড়া আর কাউকেই চিনি না! মন চাইছিল একান্তে আল্লাহর সাথে কথা বলি, তিনিই আমার সব, তিনিই আমায় পথ দেখাবেন।

পরের রাতে ঠিক শেষ প্রহরে ঘুম ভেঙে গেল আমার। বিছানা ছেড়ে জানালার পাশে এসে দাঁড়ালাম। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম মসজিদের মিনারের দিকে। একসময় ফজরের আযান হলো। হৃদয়ভরা ভালোবাসা নিয়ে আযান শুনলাম। হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করলাম প্রতিটি শব্দ।

মুসল্লিরা দলে দলে মসজিদে আসতে শুরু করেছে। ইমাম সাহেব সালাতে দীর্ঘক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত করলেন। আমি শুনে যাচ্ছি বিমোহিত হৃদয়ে। সালাত শেষে আল্লাহর প্রিয় বান্দারা সতেজ হৃদয়ে, হাসিমাখা মুখে তাসবিহ পড়তে পড়তে ঘরে ফিরছে। গাছে গাছে পাখিদের কিচিরমিচির জানান দিচ্ছে নতুন প্রভাতের। পাতায় পাতায় দোল খাচ্ছে নতুন দিনের আলো। আশেপাশের কোনো ঘর থেকে ভেসে আসছে কুরআন তিলাওয়াতের সুমধুর সুর। এর আগে কখনো এতটা নিবিষ্ট চিত্তে আযান শুনিনি, তিলাওয়াত শুনিনি। এতটা গভীর দৃষ্টিতে মসজিদ দেখিনি, মুসল্লি দেখিনি। দেখিনি সকালের প্রকৃতিও। অনুভূতির বন্ধ কপাটগুলো যেন খুলে যাচ্ছে একটা একটা করে।

সত্যের আহ্বান

তিলাওয়াতের ওই আওয়াজ যেন সারাদিন ধরে গুঞ্জরিত হতে লাগল আমার কানে। দুপুরে আনআমকে ফোন করে সারাদিনের অনুভূতির কথা জানালাম। আনআম ভীষণ খুশি হয়ে বলল—

'তোমাকে এখন আর 'মনিকা' নামে ডাকতে ভালো লাগে না। আল্লাহর লাখ লাখ শোকর, তিনি তোমার জন্য পুরস্কারের দুয়ার খুলে দিয়েছেন। কাজেই দ্রুত হাত বাড়িয়ে দাও। অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করো। তোমার প্রতিটি কথা থেকে 'আহাদ আহাদ' ধ্বনি উঠে আসছে। মনিকা, তুমি ইসলাম গ্রহণ করে নাও।'

সত্যি বলতে কি, আমারও তা-ই মনে হচ্ছিল। কিন্তু কীভাবে ইসলাম গ্রহণ করব? আমি যে কিছুই জানি না!

আনআম কথা দিল সে তার সাধ্যমতো চেষ্টা করবে। কিছু ছোট ছোট বই আর শাইখ তারিক জামিল সাহেবের ক্যাসেট পাঠাবে কয়েকটা। শেষে খুব করে বলে

Scanned with CamScanner

দিল, 'তুমি অবশ্যই বইগুলো পড়বে। ক্যাসেটগুলোও শুনবে। ভুল হয় না যেন!'

সেদিনই সন্ধ্যায় আমি বই আর ক্যাসেটগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে এলাম। এরপর শুরু হলো রাতের অপেক্ষা। পরিবারের লোকেরা কিছুতেই এসব মেনে নেবে না। তাই যা করতে হবে, সব লোকচক্ষুর আড়ালে।

আনআম আমাকে যে বইগুলো দিয়েছিল, সেগুলো দিনের বেলায় খোলার সাহস পাইনি। অন্ধকার নামতেই বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখলাম। অনেকগুলো বই— তা'লিমুল ইসলাম, আনওয়ারে হিদায়াত, ওযু-গোসলের মাসআলা ও বিধি-বিধান, ইসলামের পাঁচ রোকন, শিরক-বিদআত।

কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছি তখন। পড়ালেখায় বেশ ভালো ছিলাম। শিক্ষক-শিক্ষিকারা খুব পছন্দ করতেন আমাকে। বাসাতেও আমার পড়ালেখা নিয়ে কারও অভিযোগ ছিল না। এই সুযোগটা কাজে লাগিয়েছিলাম। রাতের বেলা আনআমের দেওয়া বইগুলো মেডিকেল কোর্সের বইপত্রের ভেতরে লুকিয়ে পড়তাম। ঘরের লোকজন যখন দেখত আমি রাত জেগে পড়াশোনা করছি, তখন খুশিই হতো। ভাবত মেয়েটা মেডিকেলের জন্য সাধ্যাতীত পরিশ্রম করছে!

বাবা ও বড় ভাইয়ারা পনেরো দিন পরপর বাড়িতে আসতেন। ফলে আমি দ্বীনি বইগুলো নিশ্চিন্তে পড়ার সুযোগ পেতাম। খেয়াল করে দেখেছি, যখনই দ্বীনি বই পড়ি, তখনই আমার মানসিক প্রবৃদ্ধি ঘটে।

হজের দিনে

জীবনে প্রথম বারের মতো শাইখ তারিক জামিলের বয়ান শুনলাম। চোখের পলকে কেটে গেল সারা রাত। অসহায় বান্দির অস্থিরতা দূর করতেই যেন আল্লাহ দ্রুত সকাল এনে দিলেন। পূব আকাশে সূর্যের কিরণ ফুটে ওঠামাত্র বিছানা ত্যাগ করলাম আমি। স্নান সেরে নাশতা করলাম বোনের সাথে। মা সাধারণত আমাদের আগেই নাশতা করে নেন। আজও ব্যতিক্রম হয়নি। ঘরের কিছু প্রয়োজনীয় কাজে সাহায্য করলাম তাকে। সব কাজ শেষে প্রশান্ত মনে আনআমকে ফোন দিলাম।

'আস সালামু আলাইকুম। আনআম, আমি আমি...' আজ প্রথম বারের মতো আমার নিজের নাম নিতে সংকোচ হচ্ছিল। মনিকা নামে নিজেকে পরিচয় দিতে ইচ্ছে করছিল না আর।

Scanned with CamScanner

'ওয়া লাইকুমুস সালাম। কী হলো! শুধু 'আমি আমি' করছ কেন? আমি তো জানি, তুমি তুমি...।' আনআমও আমার নাম ভুলে গেল ক্ষণিকের জন্য। ইতস্তত করে বলল, 'এ কী হলো! তোমার নাম কেন মনে পড়ছে না? যা-ই হোক, আজ তো তোমাকে ঈদের জন্য দৌড়ঝাঁপ করতে হবে না। আমার বাপু ম্যালা কাজ!'

'হ্যাঁ। আজ তোমাদের মতো আমার কোনো দৌড়ঝাঁপ নেই। তবে এর মধ্যে কি একটু সময় বের করতে পারবে? আমি তোমার সাথে কিছু কথা বলতে চাই। একটু পরেই বাবা আর ভাইয়ারা চলে আসবেন। তাই এখন না। রাতে ফ্রি আছ?'

'উমম...চেষ্টা করব। আজ কিন্তু আমাদের হজের দিন।'

'ও আচ্ছা, ভালো হলো। তাহলে তুমি আজ আমার জন্য দুআ করো, আল্লাহ যেন আমাকে হজ করার সৌভাগ্য দান করেন। আল্লাহ হাফিয।'

'অবশ্যই। আস সালামু আলাইকুম।'

ফোনটা রেখে রান্নাঘরে চলে গেলাম। বাবার জন্য রান্না করব আজ। আমরা ছোট তিন ভাই-বোন বাবার খুব আদরের। বাবা বাসায় এলে আমরা তার জন্য পছন্দের রান্না করি। তার কাপড়চোপড়, ওষুধপত্র এগিয়ে দিই। শরীর-স্বাস্থ্যের যত্ন নিই। খুব খুশি হন বাবা। তার শৈশব কেটেছে অনাদরে, অবহেলায়। মা-বাবাকে হারিয়েছেন খুব ছোটবেলায়। কখনো বোনদের আশ্রয়ে; আবার কখনো বড় ভাইদের দয়া আর করুণায় তার বেড়ে ওঠা। তারা কিছু দিলে খেতেন। নয়তো উপোস থাকতেন সারাবেলা। তারা যতটুকু পড়িয়েছেন, ততটুকুই পড়তে পেরেছেন।

প্রাপ্ত বয়সে এসে তার মনে হলো, এবার নিজে থেকে কিছু করা দরকার। নিজের পায়ে দাঁড়ানো দরকার। এই অনুভূতি থেকেই গায়ে-গতরে খাটতে শুরু করেন তিনি। একপর্যায়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষমও হন। ওদিকে হিন্দু ঘরানারই আরেক বংশে আমাদের মাতুলালয়। তারা যখন দেখল, ছেলের একক উপার্জনে ভাগ বসানোর মতো কেউ নেই, তখন সুযোগ বুঝে ছেলের হাতে তাদের পরিবারের এক মেয়েকে গছিয়ে দিল। মেয়ের পরিবারের চলন-বলন ও সংস্কৃতি কেমন, সেটা আর কেউ পরখ করে দেখার গরজ করেননি। ফলে অনেক কিছুই এলোমেলো হয়ে যায়। তারপরও এখন যেহেতু তিনি আমার মা, আর তার পদতলেই আমার জান্নাত; তাই তার ব্যাপারে বেশি কিছু না বলাই সমীচীন আমার জন্য। শুধু এতটুকু বলি, সংসারের

Scanned with CamScanner

ঘোর-প্যাঁচ আর অশান্তি থেকে বাঁচতে বাবা আমাদের ছোট তিন-ভাইবোনকে আগলে রেখেছিলেন। তখন কি তিনি জানতেন, তার আদরের মেয়ে দুটো তাকে কত বড় আঘাত দিতে চলেছে!

মনিকা থেকে আয়িশা

রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষে গল্প হচ্ছিল বাবার সাথে। বিছানায় বসে তার পা টিপে দিচ্ছিলাম আর গল্প করছিলাম। একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন বাবা। আমিও চলে এলাম নিজের রুমে। ওযু করলাম। আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলাম নিজের জন্য। এরপর ফোন হাতে নিয়ে আনআমকে কল করলাম—

'আস সালামু আলাইকুম। কে বলছেন?'

'ওয়া লাইকুমুস সালাম। বুঝে নিন, কে হতে পারে!'

'সুযোগ পেলে তাহলে! তোমার বাবা, ভাইয়ারা এসে পড়েছেন বলে আমি আর ফোন করতে পারিনি!'

'ভালোই করেছ। যাই হোক, আমি এখন যা বলছি, তা মনোযোগ দিয়ে শোনো। সম্ভবত এই মুহূর্তের পর তুমি আর 'মনিকা' নামের কাউকে পাবে না।'

'কেন? কী হয়েছে? এমন কথা বলছ কেন? কোথায় চলে যাবে তুমি?'

'ওই আকাশেরও ঊর্ধ্বে চলে যাব। বেরিয়ে পড়ব অনিঃশেষ আলোর উদ্দেশে।'

'আহ-হা! কী হেঁয়ালি শুরু করলে!'

'আনআম, আমি ইসলাম গ্রহণ করতে চাচ্ছি। প্লিজ, আমাকে সাহায্য করো।'

'আল-হামদু লিল্লাহ। মুবারক হোক। আজ সন্ধ্যা থেকেই কিন্তু শুরু হয়ে গেছে পবিত্র ঈদুল আযহা। ঈদ মুবারক বন্ধু।'

'শুকরিয়া। আমার পরকাল সাজিয়ে তোলা বোনটিকেও অনেক অনেক মুবারকবাদ। শোনো, আমি গতকাল থেকেই বারবার কালিমা পড়ে চলেছি। এরপরও চাচ্ছি, তুমি আমাকে কালিমা পড়িয়ে দাও।'

Scanned with CamScanner

আনআম আমাকে বিসমিল্লাহ পড়িয়ে প্রথমে 'কালিমায়ে তাওহিদ' আর 'কালিমায়ে শাহাদাত' পাঠ করাল। এরপর কালিমা দুটির অর্থ বলল। প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাও করে শোনাল। ব্যাখ্যা শেষে আবারও কালিমা দুটি পড়িয়ে দিল আমাকে। এবার নাম বদলের পালা। বেশ কিছু নাম থেকে 'আয়িশা' নামটা বেছে নিলাম আমি। এভাবেই আমি মনিকা থেকে আয়িশা হয়ে উঠলাম। আল-হামদু লিল্লাহ। আমাকে দ্বিতীয় বারের মতো মুবারকবাদ জানিয়ে ফোন রেখে দিল আনআম।

আনন্দের আতিশয্যে আমি যেন মেঘের ভেলায় ভেসে বেড়াচ্ছিলাম। জীবনে প্রথম বারের মতো এতটা আনন্দিত হলাম যে, মনে হতে লাগল, কেউ আমার অসাড় দেহে নতুন করে প্রাণ ফুঁকে দিয়েছে। অনিঃশেষ চঞ্চলতা এনে দিয়েছে মনের গহীনে। ফোন রেখেই মেহেদি লাগালাম হাতে-পায়ে। আমার 'ঈদ' যে শুরু হয়ে গেছে!

মেহেদি রাঙা হাতে কখন যে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছি, মনে নেই। ওই সময় বারবার মনে পড়ছিল আল্লাহর সাথে মুসা আলাইহিস সালামের কথোপকথনের ঘটনা। আল্লাহর সাথে তিনি কীভাবে কথা বলেছেন, সেই দৃশ্য কল্পনা করছিলাম চোখ বন্ধ করে। আর মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম, 'হে আল্লাহ, আমাকেও সেই সৌভাগ্য দান করো। হে আল্লাহ, আমি জীবনের গতিপথ পরিবর্তন করে তোমার অভিমুখে রওনা করেছি। এ পথে অবিচল থাকার দৃঢ় প্রত্যয় দাও আমায়। যত পরীক্ষাই আসুক, আমাকে অবিচল থাকার তাওফিক দাও। হে মালিক, আমি জানি না, পরীক্ষার মুহূর্তগুলো কত দূরে; কিন্তু তুমি তো জানো। সুতরাং, তুমিই আমাকে রক্ষা করো। ও আল্লাহ, আমি আত্মভোলা দুর্বল বান্দি তোমার। আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও।'

প্রথম স্বপ্ন

কতক্ষণ এভাবে প্রার্থনা করছিলাম মনে নেই। প্রার্থনার মধ্যেই একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। রাতে স্বপ্নে দেখি—তীব্র আলো ঠিকরে পড়ছে আমার ওপর। সেই আলোয় ভর করে আমি ক্রমশ ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছি। উঠছি তো উঠছিই। একপর্যায়ে চন্দ্র ও নক্ষত্রের স্তর ছাড়িয়ে আমি আরও ওপরে উঠে গেলাম। চন্দ্র ও নক্ষত্রও তখন আমার সাথে ওপরে উঠতে থাকে। একসময় দেখি আলোর বেষ্টনীতে সুরক্ষিত একটা আসন। আসনটিতে আমি বসলাম; মনে হলো যেন জান্নাতে বসে আছি।

Scanned with CamScanner

এর পরপরই ঘুম ভেঙে গেল। তাহাজ্জুদের সময়। মহান আল্লাহ যেন চাইছেন আমি উঠে পড়ি। স্বপ্নটা দেখে কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমি জন্ম থেকেই মুসলিম। আর এই স্বপ্নের মাধ্যমে প্রিয় আল্লাহ আমার কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন; আমাকে সাহায্য আর পুরস্কারের আগাম সুসংবাদ দিয়েছেন।

বিছানা থেকে উঠে নিজের মতো করে ওযু করে নিলাম। চাদর বিছিয়ে বসে পড়লাম মেঝেতে। তখনো আমার দুচোখের গভীরে স্বপ্নের দৃশ্যগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে। সালাত পড়ার নিয়ম জানি না। এ জন্য বসে বসে আল্লাহর কাছে অবিচলতা আর পোক্ত ঈমানের দুআ করলাম। দুআর মাঝে বুঁদ হয়ে রইলাম দীর্ঘক্ষণ। চাদর ভিজে একাকার হয়ে গেল চোখের জলে। এমন এক ঘোর-লাগা আবেশে হারিয়ে গেলাম যে, মনে হচ্ছিল বিরান এক ভূমিতে আমি একা পড়ে আছি। আল্লাহ ছাড়া আমার সাথে আর কেউ নেই।

একটু পরে মসজিদ থেকে ফজরের আযান ভেসে এলো। পূর্ণ মনোযোগের সাথে আযানের শব্দগুলো শুনলাম। হৃদয় ভরে উঠল প্রশান্তিতে। খানিক বাদেই ঈদের সালাত। আজই আমার জীবনের প্রথম ঈদ।

দ্বীনের প্রথম দাওয়াত

আমি বেশ যত্নের সাথে প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। ছোট বোন নীলমকে বললাম, 'আজ আমার জীবনের প্রথম ঈদ। এখন থেকে আমার নাম আয়িশা।'

ও ভেবেছিল আমি ওর সাথে মজা করছি। তাই বলল, 'গপ্পো করার আর সময় পেলে না!'

আমি বললাম, 'দেখ, আমি তোকে সত্যি কথাই বলছি। আমি মুসলিম হয়ে গেছি। আমি যা করেছি, দীর্ঘ সময় ভেবে-চিন্তেই করেছি। তুই শুধু আমার জন্য একটা কাজ কর। আমার এ পরিবর্তনের কথা কাউকে বলবি না। এখনো বলার সময় হয়নি।'

'কী আবোল-তাবোল বকছ দিদি? তুমি কখন মুসলিম হলে? এখন তোমার কী হবে?'

'তুই মুখ বন্ধ রাখতে পারলে কিছুই হবে না, ইন শা আল্লাহ। আল্লাহ আমার সাথে আছেন।'

Scanned with CamScanner

নীলমের বিস্ময় কাটছিল না। কী ঘটেছে কিছুই বুঝতে পারছিল না আসলে। খোলাসা করে সব জানালাম ওকে। ইসলাম সম্পর্কেও অনেক কিছু বললাম। নীলম তখন বলল, 'সব ঠিক আছে; কিন্তু এখন তোমার কী হবে?'

'যদি আবেগ ও নিয়ত ঠিক থাকে, তাহলে কিছুই হবে না। ইসলাম সত্য ধর্ম। আমাদের পরকাল নষ্ট করা ঠিক হবে না রে, নীলম। আমি তোকে ইসলামগ্রহণের দাওয়াত দিচ্ছি। তুইও ইসলাম গ্রহণ করে নে। মুসলিম হয়ে যা প্লিজ। এতেই আমাদের জন্য কল্যাণ। পরকালের শাস্তি খুব মারাত্মক নীলম, খুবই মারাত্মক। এই বাড়ির সবাইকে নিয়ে আমার খুব চিন্তা হয়। আল্লাহ যদি তাদের সঠিক পথের দিশা না দেখায়? তখন কী হবে? আমি ভাবতেও পারি না! নীলম, তুই যদি ইসলাম গ্রহণ করিস, তাহলে আমি মনে করব, আল্লাহ তোকেও কবুল করেছেন। আমরা দুজন মিলে একসঙ্গে বাবা-মা আর ভাই-বোনদের ইসলামের দাওয়াত দেবো। ইন শা আল্লাহ, আমাদের পুরো পরিবার একদিন ইসলাম গ্রহণ করবে।'

আমার কথার উত্তরে নীলম কিছুই বলল না। নির্বাক হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বুঝলাম বেশি তাড়াহুড়া করা ঠিক হবে না। ওর সময়ের প্রয়োজন। আল্লাহ চাইলে একদিন নীলমও সত্যের খোঁজ পাবে।

তখন থেকে আমি ধীরে ধীরে ওকে আনআমের দেওয়া বইগুলো পড়ে শোনানো শুরু করলাম। শাইখ তারিক জামিল সাহেবের সেই ক্যাসেটগুলোও শোনাতে লাগলাম। একরাতের ঘটনা। গভীর রাতে কানে হেডফোন লাগিয়ে শাইখের বয়ান শুনছিলাম আমরা। হুট করে বাবা চলে এলেন ঘরে। আমাদের কানে হেডফোন দেখে বললেন, 'কী হচ্ছে? গান শুনছ বুঝি!'

আমরা ততক্ষণে ঘাবড়ে গেছি। এটা-সেটা বলে পাশ কাটানোর চেষ্টা চালাচ্ছি। কিন্তু শব্দগুলো মুখে আটকে যাচ্ছিল বারবার।

আমাদের জড়তা দেখে বাবা বললেন, 'আমি তো এমনিতেই বলেছি। কিছুই হয়নি। তোরা খামাখা ঘাবড়ে যাচ্ছিস কেন? এখন তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়। রাত জাগলে মাথা ব্যথা করে।'

বাবা চলে গেলেন। আমরাও যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। শাইখ তারিক জামিলের ক্যাসেট শুনলে আমার চোখে পানি চলে আসত। ভাবতাম, মানুষের কী হলো! তারা

Scanned with CamScanner

কি শাইখের বয়ান শোনে না? তার কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করে না?

নীলমকে ক্যাসেটগুলো শোনানোর পর বলতাম, 'দেখ, আল্লাহ তাআলা কী বলেছেন আর আমরা কী করছি!'

নীলম মনোযোগের সাথেই শুনত; কিন্তু কিছু বলত না। আসলে ও কথাগুলো ঠিকই বুঝত; কিন্তু মাত্র পনেরো বছরের একটা মেয়ের পক্ষে আর কতটুকুই-বা দুঃসাহস দেখানো সম্ভব! ভয় আর অজানা আতঙ্ক তাকে ভাবতে বাধ্য করত। তবে এটাও সত্য—ও খেলাধুলার বলয় থেকে খানিকটা বেরিয়ে এসেছিল। ঘরের কনিষ্ঠ সদস্য হওয়ার কারণে একদিকে যেমন সবার আদরের ভাগীদার ছিল; অন্যদিকে বাড়ির বড়দের চোট-ধমকও ওর জন্যই বরাদ্দ ছিল। খেলাধুলাপ্রিয়, খাবারদাবারে বায়না-করা এক কম বয়সি মেয়ের পক্ষে হঠাৎ এত বড় পদক্ষেপ নেওয়াটা সহজ ব্যাপার ছিল না।

আমার আর নীলমের পরিস্থিতি এক নয়। ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি অনুরাগ ছিল আমার। নিজেকে সবসময় শালীনতার চাদরে আবৃত করে রাখতে ভালোবাসতাম। মাথায় ওড়না দিয়ে স্কুলে যেতাম, কেউ কেউ ভাবত আমি বুঝি মুসলিমই।

স্কুলের ইসলামিয়াতের বইগুলো পড়তে বেশ ভালো লাগত। কোনো সহপাঠী হামদ পরিবেশন করলে তন্ময় হয়ে শুনতাম। কখনো কখনো আমার নিজেরও না'ত গাওয়ার শখ জাগত। একবার আমাদের স্কুলে একটা বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। আমার খুব করে মন চাইছিল সেখানে না'ত পরিবেশন করব। আয়োজকদের আমার ইচ্ছের কথা জানিয়েছিলাম। তারা আমার নিষ্পাপ ইচ্ছেটাকে একদমই গুরুত্ব দেননি। তার ওপর স্কুলের একজন মুসলিম শিক্ষক হিন্দুদের খুবই অপছন্দ করতেন। আমার কথা শুনেই মুখের ওপর বলে দিয়েছিলেন, 'তুমি তো হিন্দু! তুমি কেন না'ত গাইবে?'

কী পরিমাণ কষ্ট যে আমি পেয়েছিলাম সেদিন—বলে বোঝাতে পারব না। হিন্দু বন্ধুরা আমাকে বিমর্ষ দেখে সান্ত্বনা দিয়েছিল অবশ্য। বলেছিল, 'শিক্ষকরাই যদি না'ত গাইতে না দেন, তাহলে আমরা কেন গাইতে যাব। যা হয়েছে ভুলে যাও। মুসলিমরা এমনই।'

Scanned with CamScanner

আমার কেন যেন সব মুসলিমকে এক রকম মনে হয়নি। মুসলিমদের থেকে কষ্ট পেয়ে ইসলামকে ভুল বুঝতে মন সায় দেয়নি। বরঞ্চ একটা আলোর কিরণ আমার সামনে সবসময়ই ঝলক দেখিয়ে উবে যেত। সেই আলোর কিরণকে ছুঁতে পেরেছি আনআমের সাথে পরিচয়ের পর। তার আগে কোনো মুসলিমের কাছ থেকে দ্বীনের দাওয়াত পাইনি আমি।

এ তো গেল আমার কথা। নীলমের গল্পটা ভিন্ন রকম। ওর মনে ইসলাম নিয়ে কোনো বাড়তি অনুরাগ ছিল না। ইসলামের ডাকে এত সহজে সাড়া সে না-ই দিতে পারে। নীলমের মনে ইসলামের যে বীজ বুনে দিয়েছি, সে বীজকে রাখতে হবে নিবিড় পরিচর্যায়। সে বীজ থেকে চারা হবে। তাতে সময়ে সময়ে সেচ দিতে হবে। করতে হবে আগাছা দমন। তবেই-না বীজ পরিণত হবে মহীরুহে।

কুরআন শেখার আগ্রহ

আমাদের বাড়িওয়ালিকে আমরা আন্টি বলে ডাকতাম। কুরআন শিক্ষার পথ সুগম করতে একদিন আন্টির কাছে উপস্থিত হলাম আমি। তাকে আমার ইসলামগ্রহণের কথা জানালাম। তিনি ভীষণ খুশি হলেন, মুবারকবাদ জানালেন আমাকে। কিন্তু যখন তাকে বললাম, 'আমি কুরআন শিখব; আপনি আমাকে একটি কায়দা এনে দিন'—তখনই দ্বিধা করতে শুরু করলেন তিনি। বললেন, 'মা, তুমি এখনো অনেক ছোট। এত কিছু সামলাতে পারবে না। এ অবস্থায় তোমার হাতে কুরআন তুলে দেওয়া যাবে না! তাছাড়া কুরআন হাতে নেওয়ার আগে ওযু করতে হয়। অনেক সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে পড়তে হয়।'

আমি বললাম, 'আন্টি, প্রথমে তো আপনাকে বেশ খুশিই দেখাচ্ছিল। এখন এমন দেখাচ্ছে কেন! কী হয়েছে আপনার? আমি তো এমনিতেও সবসময় ওযু-সহকারে থাকি। আমি কেন কুরআনুল কারিমের প্রতি সম্মান দেখাব না, শ্রদ্ধা দেখাব না! আমি তো কুরআন পড়াকে জীবনের চেয়েও বড় মনে করি।'

'মা, তুমি যেমন ভাবছ, বিষয়টা তেমন নয়। আমি মূলত তোমার ঘরের লোকদের ভয় পাচ্ছি। তারা এগুলো কিছুতেই মেনে নেবে না। একে তো তুমি মেয়ে। তার ওপর বয়সও কম। ঘরের লোকেরা জানতে পারলে, তোমাকে ইসলামের ওপর থাকতে দেবে না! অল্প কদিনের মধ্যেই কোনো হিন্দু পরিবারে তোমাকে বিয়ে দিয়ে দেবে। আমিও তখন তাদের কাছে অপরাধী হয়ে যাব। এবার বলো, কী করে তোমাকে কায়দা পড়াই!'

Scanned with CamScanner

আমি তখন একটা ভারী নিঃশ্বাস ছেড়ে বললাম, 'আয়িশা প্রয়োজনে জীবন দিয়ে দেবে; তবু নিজের দ্বীন ত্যাগ করবে না।'

এ কথা বলে আন্টির কাছ থেকে চলে এলাম আমি। এরপর গেলাম আমার এক মুসলিম বান্ধবী আমিনার বাড়িতে। ওর কাছ থেকে সালাতের নিয়মকানুন শিখে নিচ্ছিলাম। ভাবলাম কুরআনটাও না-হয় ওর কাছেই শিখব। তাই ওকে গিয়ে বললাম, 'তুমি তো আমাকে সালাত শেখাচ্ছ; কিন্তু কুরআন শেখাবে কে?'

আমিনা আমাকে চমৎকার বুদ্ধি বাতলে দিল। আমাদের বাসার ঠিক সামনে, মাত্র দু-কদম দূরেই পাঠানদের বসবাস। সেখানে এক বাসায় একজন ভদ্রমহিলা দিনভর একা থাকেন। মহিলার স্বামী-সন্তানের ঘরে ফিরতে বেশ রাত হয়। বান্ধবী বলল, 'একটু কষ্ট করে তার সাথে যোগাযোগ করো। কারণ, তোমাকে নিয়মিত সময় দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। না হলে আমিই তোমাকে কুরআনের তালিম দিতে পারতাম। তাছাড়া তুমি প্রতিদিন আমার বাসায় এলে তোমার ঘরের লোকজনও সন্দেহ করবে। কিন্তু ওই পাঠান মহিলা তোমার খুব কাছের প্রতিবেশী। তাই তার কাছে কুরআন শেখাই নিরাপদ মনে হচ্ছে।'

তার পরামর্শ আমার মনে ধরল। আমি পাঠান মহিলার বাড়িতে হাজির হলাম। তাকে সবিনয়ে বললাম, 'আন্টি, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি।' আমার কথা শুনে তিনি বেশ বিস্মিত হলেন। এরপর প্রচণ্ড আবেগের সাথে বুকে জড়িয়ে নিলেন। তিনি এত বেশি মমতা দেখালেন যে, আমার চোখে অশ্রু চলে এলো। মনের অজান্তেই তাকে তুলনা করে ফেললাম নিজের মায়ের সাথে—

'আল্লাহ, আমি তো শৈশব থেকেই এমন মাতৃসুলভ আদর-স্নেহের কাঙাল ছিলাম। এমন অকৃত্রিম ভালোবাসা কেবল মায়েদের পক্ষেই সম্ভব। আমার জন্মদাত্রী মায়ের ভান্ডারে কি এমন স্নেহ-ভালোবাসা নেই?'

আবেগের আতিশয্যে আমাদের দুজনের ধাতস্থ হতেই বেশ সময় লাগল। কিছুক্ষণ পর তার কাছে হাজির হবার কারণ খুলে বললাম। আন্টি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও অভিজ্ঞ। তিনি আমার সামনে সম্ভাব্য সমস্ত চড়াই-উতরাইয়ের চিত্র তুলে ধরে বললেন, 'দেখো মা, তুমি এখন যে পথ গ্রহণ করেছ; নিঃসন্দেহে সেটাই সত্য ও সহজ পথ। কিন্তু এ পথে চলতে গেলে তোমার জীবনে অনেকগুলো জটিলতা দেখা দেবে। অসামান্য ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। সময় তোমার সামনে নানা রূপে আবির্ভূত

Scanned with CamScanner

হবে। কাজেই ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে তোমাকে। তুমি তো ছেলে নও যে, ঘরের লোকেরা অমত করলে হুট করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে। তুমি একজন মেয়ে। তুমি ঘর থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে হাঙ্গামা শুরু হয়ে যাবে। মান-সম্মান নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেবে। আপনজন শত্রুতে পরিণত হবে। বিষয়গুলো কি ভেবে দেখেছ কখনো?'

'জি, আন্টি। আমি যে মহান ধর্মের আশ্রয়ে এসেছি, এগুলো কি তার চেয়েও বড়! আমি যে আল্লাহর রজ্জু আঁকড়ে ধরেছি; তিনি কি আমাকে অসহায় ছেড়ে দেবেন! তিনি তো এ অঙ্গীকার করেছেন, যে যত বেশি আবেগ নিয়ে তাঁর কাছে আসবে, সে তত বেশি তাঁর নৈকট্য লাভ করবে।'

এরপর আন্টির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। বাসায় ফিরে বান্ধবী আমিনার কাছে সব ঘটনা খুলে বললাম। তখন আমিনা বলল, 'তাহলে এক কাজ করো। কাল তুমি আমার বাসায় চলে এসো। আমি তোমার কথা আম্মুকে খুলে বলব। আম্মু নিশ্চয়ই কোনো একটা পথ বাতলে দেবেন।'

আমি পরদিন আমিনার বাসায় এলাম। এখানে এসে বুঝলাম, এতক্ষণ যাবৎ ও আমার জন্যই অপেক্ষা করছিল। ওর আম্মু আমাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। কপালে চুমু খেলেন। সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। এরপর আমার হাতে নুরানি কায়দা তুলে দিয়ে বললেন, 'এসো, মা। কায়দা শুরু করো। আল্লাহ সামনে যা মঞ্জুর রেখেছেন, তা-ই ঘটবে।' এভাবে আমি তার কাছে কায়দা পড়তে শুরু করলাম। আল-হামদু লিল্লাহ। আমি আল্লাহর সাহায্য পেয়ে গেছি। তার সেদিনের সম্মান, আদর ও ভালোবাসার কথা আমি কখনোই ভুলব না। তার বুকে মাথা রাখার সময় মনে হয়েছিল, আমি বুঝি পৃথিবীর মাটিতে নতুন করে জন্ম নিয়েছি।

পর্দা

পর্দার বিধি-বিধান জানার পর নিকাবও পরা শুরু করলাম। আমার এই পরিবর্তন দেখে পরিবারের সদস্যদের চক্ষু চড়কগাছ। কেউ কেউ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, 'কী ছাইপাঁশ শুরু করলে! ফেলো এসব। এগুলো কোত্থেকে শিখেছ? আমাদের ধর্মে কি এই জঞ্জাল আছে! তোমার দেখাদেখি নীলমও চাদর পরা শুরু করেছে। তুমি যা করো, নীলমও তা-ই করে। দয়া করে এসব ছাড়ো। নয়তো তোমাকে বিয়ে দিতে ভীষণ রকম সমস্যা হবে।'

Scanned with CamScanner

আমি কখনোই ঘরের লোকদের এসব শাসন কানে তুলিনি। মুসলিম হওয়ার পর শারয়ি পর্দা শুরু করে দিই। তখন আপন দুলাভাইয়ের সাথেও পর্দা করতাম। আমার এসব কাণ্ড দেখে সবাই হাসাহাসি করত।

মেজো বোন লক্ষ্মীর শ্বশুরবাড়ি ছিল আমাদের দু-গলি পরেই। ও প্রায় প্রতিদিনই বাসায় আসত। দু-সংসারের বাজার-সদাই একসঙ্গে করত। আমি আর নীলম যখন ওর সাথে বাজারে যেতাম, তখন এই পর্দার কারণে দিদি আমাদের আচ্ছামতন ধমকাত। ওর ধমকের ভয়ে নীলম মুখের নিকাব খুলে ফেলত। কিন্তু আল-হামদু লিল্লাহ, ও কোনোদিন আমার মুখের নিকাব সরাতে পারেনি। এ সময় আমি বিয়েশাদির অনুষ্ঠানগুলোতে যাওয়া পুরোপুরি ছেড়ে দিই। আগেও যখন দুই-একবার কারও কোনো অনুষ্ঠানে যেতাম, তখন মানুষ আমার পরনের পোশাকের সাথে আম্মুর পোশাকের তুলনা করে বলত, 'মা-মেয়ের পোশাক দেখো। মেয়ে কী পরেছে, আর মা...!'

আত্মীয়দের সামনে পর্দা নিয়ে বিব্রত হওয়ার এমন অনেক ঘটনাই আছে। একবার আত্মীয়রা মিলে করাচির সী বিচে গিয়েছি পিকনিক করতে। আমি আর নীলম ছাড়া পরিবারের কেউই ওড়না পরেনি। সবার পরনে আধুনিক পোশাক। ছেলেমেয়েরাও একসাথে পানিতে দাপাদাপি করছে। এরমধ্যে কয়েকজন আমাদের পোশাক দেখে অস্তিত্ব সংকটে পড়ে গেছে। আমাদের কারণে নাকি পরিবারের বদনাম হচ্ছে। কেউ কেউ আবার চাপাচাপি শুরু করে দিয়েছে যেন ওড়না খুলে ফেলি আমরা। ওড়না সেকেলে মেয়েদের পোশাক। প্রস্তরযুগের পোশাক আর সংস্কৃতি নিয়ে পড়ে আছি আমরা।

আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, যে যা-ই বলুক, কিছুতেই ওড়না সরাব না। আমার মা-ও আত্মীয়দের সাথে তাল মিলিয়ে আমাকে বকাঝকা করছিলেন। টিপ্পনি কেটে বলছিলেন, 'এ মেয়ে-দুটো জন্ম থেকেই গোঁয়ার। সারাক্ষণ চাদর মুড়িয়ে থাকে। আসলে ওদের শরীর বিশ্রী তো, তাই চাদরের আড়ালে লুকিয়ে রাখে।'

মায়ের বিদ্রূপ শুনে অন্য মেয়েরা হাসছিল খুব। এমন সময় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। হুট করে দেখি দুই আত্মীয়া দৌড়ে আসছে। ওড়না চাইছে আমার আর নীলমের কাছে। পানিতে নেমে তাদের গায়ের পোশাক এমনভাবে লেপ্টে গেছে যে নিজেরাই ভীষণ লজ্জা পাচ্ছে। অগত্যা উপায় না দেখে ওড়না চাইছে গা ঢাকবে বলে। খুব মজা পেয়েছিলাম সেবার। কিছুক্ষণ আগেই তারা আমাদের ওড়না নিয়ে হাসছিল। আল্লাহ কী অদ্ভুতভাবে দৃশ্যপট পালটে দিলেন!

Scanned with CamScanner

নীলম

আল্লাহর ইচ্ছায় আমার ছোট বোন নীলম অনেক কাজেই আমাকে সহায়তা করেছে। অথচ ও তখনো পুরোপুরি ইসলাম গ্রহণ করেনি। তবে মনে মনে ইসলামের প্রতি আকর্ষণবোধ করত। আমি যখন সালাতে দাঁড়াতাম, ও তখন বাইরে বসে পাহারা দিত। কায়দাসহ আমার কাছে যেসব দ্বীনি কিতাব ছিল, ও সেগুলো সংরক্ষণ করত। বিশেষ করে আমি যখন কলেজে যেতাম, ও তখন আমার জিনিসগুলোর প্রতি পাখির মতো সজাগ দৃষ্টি রাখত। কারণ আম্মু প্রায়শই আমাদের রুমে এসে সবগুলো জিনিস ওলট-পালট করে ফেলতেন। আলমারির জিনিস বাইরে ফেলে রেখে চলে যেতেন। এক জায়গা থেকে বই তুলে অন্য জায়গায় লুকিয়ে রাখতেন। আমাদের পেরেশান করে, পড়াশোনার বিঘ্ন ঘটাতেই তিনি এগুলো করতেন। এ ধরনের পরিস্থিতি ঠেকাতে নীলম আমার দ্বীনি বইগুলো যত্নের সাথে লুকিয়ে রাখত। ওর এ উপকারের কথা আমি কোনোদিনও ভুলব না। এভাবে প্রতিনিয়ত ধর্মীয় বই নাড়াচাড়ার কারণে ধীরে ধীরে ইসলামের ওপর ওর পড়াশোনা বাড়তে থাকে। ক্রমশ ইসলামের কাছাকাছি আসতে শুরু করে নীলম।

আনআম আমাদের শাইখ তারিক জামিল সাহেবের যেসব সিডি দিত, নীলম সেগুলো পূর্ণ মনোযোগের সাথে শুনে আমাকে ফিরিয়ে দিত। আমি যখন সালাত পড়তাম, ও তখন বেশ আগ্রহ নিয়ে আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখত। স্টোর রুমের ভগবানগুলোর কথা আমরা প্রায় ভুলতে বসেছিলাম। কখনো কখনো ওই মূর্তিগুলো দেখে ভয় পেয়ে যেতাম। এখন আর সেগুলোকে ভগবান মানি না আমরা। এই যখন অবস্থা, তখন একদিন নীলমকে বললাম, 'এখন থেকে আমাকে আয়িশা নামে ডাকবে।' উত্তরে ও বলল, 'আমি পারব না। আমার ভয় করছে।'

আরেকদিনের ঘটনা। আমাদের এক আত্মীয়ের বিয়ে। নীলম ওই অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য প্রচণ্ড জিদ করল। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানতাম, ওই অনুষ্ঠানে অনাচার ও অশ্লীলতা ঘটবে। তাই আমি কৌশলে সেই বিয়েতে যাওয়া ঠেকালাম। আসলে নীলম তখন এতটাই ছোট আর অবুঝ ছিল যে, এসব অশ্লীলতা-অনাচার সম্পর্কে ওর সুস্পষ্ট কোনো ধারণাই ছিল না। এগুলো যে অনাচার, সে কথাই সে ভালো করে জানত না। নীলম তখন মনের কষ্টে কেঁদেছিল; কিন্তু তারপরও আমি যেতে দিইনি। একদিন ও নিশ্চিত বুঝবে কেন তার বোন বাধা দিয়েছিল।

Scanned with CamScanner

সালাতের দাওয়াত

আমি তখন মিরপুরখাস জেলার গভর্নমেন্ট মডেল কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। রোজ কলেজে যেতে হতো আমাকে। সেখানে আমার প্রচুর মুসলিম ও অমুসলিম বান্ধবী ছিল। তারা আমাকে 'মনিকা' নামেই জানত। এক মুসলিম বান্ধবীর সাথে আমার বেশ সখ্যতা ছিল। একদিন কলেজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওকে বললাম, 'আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল-হামদু লিল্লাহ। কীভাবে সালাত আদায় করতে হয় তা শিখছি এখন। দ্বীন শেখার কাজে তুমি আমাকে সাহায্য করলে খুবই উপকার হতো।'

সেই বান্ধবীর নাম ছিল সাফিয়া। আমার ইসলামগ্রহণের সংবাদ শুনে ও যারপরনাই আনন্দিত হয়ে বলল, 'আমি অনেক অনেক খুশি হয়েছি। অবশ্যই তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে। জানা থাকলে আমি তোমাকে অবশ্যই জানাব।'

কিন্তু পরে যখন জানতে পারলাম, ও সালাত পড়ে না, তখন ভীষণ কষ্ট হলো। ওকে সরাসরি বললাম, 'সাফিয়া, তুমি কত সৌভাগ্যবান জানো? ইচ্ছে করলেই তুমি প্রকাশ্যে সালাত পড়তে পারো। তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, দিনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয। এরপরও তুমি কীভাবে ফরয কাজে গাফিলতি করছ! অথচ আমার অবস্থা এমন যে, এক ওয়াক্ত সালাতও নির্ভয়ে আদায় করতে পারি না; বোনকে বাইরে পাহারায় বসিয়ে কিংবা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে ভয়ে ভয়ে সালাত আদায় করতে হয় আমার।'

আমার কথা শুনে সাফিয়া লজ্জা পেল খুব। বললাম, 'এখন থেকে তুমি আমার পথপ্রদর্শক। তুমি নিজে সোজা পথে চললেই তো তোমার অনুসরণ করে আমি সোজা পথে চলতে পারব। তোমাকে লজ্জা দেওয়ার জন্য কথাগুলো বলিনি কিন্তু।'

সেদিন সাফিয়া খুব অনুতপ্ত হয়েছিল। বলেছিল, 'আসলেই আমি ভুল করেছি। এখন থেকে আর অলসতা করব না, ইন শা আল্লাহ।'

এরপর থেকে সাফিয়া সালাতে নিয়মিত হয়ে যায়। আল্লাহর শোকর যে, আল্লাহ আমাকে দ্বিতীয় বারের জন্য দ্বীনের দাঈ হওয়ার তাওফিক দিয়েছিলেন। প্রথম বার আমি নীলমকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলাম; দ্বিতীয় বার সাফিয়াকে সালাতের দাওয়াত।

Scanned with CamScanner

দুআ

আমিনার মায়ের কাছে কুরআন শিখছি, তখনকার ঘটনা। একদিন ঘরে ঢুকে দেখতে পেলাম, বড় দু-ভাই আম্মুকে জেরা করছে। তাদের প্রশ্ন, মনিকা প্রতিদিন নীলমকে নিয়ে কোথায় যায়?

ভাগ্যিস, মা তেমন একটা গুরুত্ব দেননি। নীরস কণ্ঠে বলেছেন, 'আমি কী জানি, ওরা কোথায় যায়? এক মুসলিম মেয়ের ঘরে যায়, এতটুকুই জানি।'

বুঝতে পারলাম ভাইয়ারা আমাকে সন্দেহের চোখে দেখছে। সতর্ক হয়ে যেতে হবে। নীলমকে ডেকে বললাম, 'আমিনাদের ঘরে আমার যাওয়াটা সম্ভবত বন্ধ হয়ে যাবে রে। হায় আল্লাহ, এখন আমি কী করব? কার কাছে কায়দা শিখব? কোথায় যাব? বাসার আশপাশে যেসব মুসলিম আন্টি থাকেন, তারা তো আমার বাসার লোকদের ভয় পান।'

ভগ্ন হৃদয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করতে লাগলাম, 'আল্লাহ, আমাকে সাহায্য করো। আমি তোমার কালাম শিখতে চাই। তুমিই এর একটা ব্যবস্থা করে দাও। ও আল্লাহ, যেটুকু শিখেছি, তাতেই তোমার বাণীর স্বাদ পেয়ে গেছি। এই স্বাদ থেকে আমাকে বঞ্চিত কোরো না।

আল্লাহ, আমি তো কুরআনকে ভালোবাসি। এ ভালোবাসা যে এখন পরিণত হয়েছে জ্বলন্ত উনুনে! তুমি আমার জন্য নিরাপদ একটা পথ বের করে দাও—এমন বন্দোবস্ত করে দাও, যা আমি কোনো দিন কল্পনাও করিনি।'

বরাবরের মতোই একদিন কাঁদো কাঁদো হয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করছিলাম, হঠাৎ মনে হলো, পাঠান আন্টির কাছে আরেকবার অনুরোধ করা যেতে পারে। তাকে খুব করে অনুরোধ করলে হয়তো রাজি হয়ে যাবেন। যেই ভাবা সেই কাজ। সেদিনই সন্ধ্যায় আমি পাঠান আন্টির বাসায় উপস্থিত হলাম, তার কাছে ধরনা দিলাম দ্বিতীয় বারের মতো।

অনুনয়ের সুরে বললাম, 'আন্টি, আমি আপনার কাছে একই অনুরোধ নিয়ে আবার এসেছি। দয়া করে আমাকে কায়দা শিখিয়ে দিন। আমিনা নামের এক বান্ধবীর বাসায় এতদিন খানিকটা শিখেছি। কিন্তু তাদের বাসায় এভাবে প্রতিদিন যাতায়াত করায় বড় ভাইয়ারা এখন আমাকে সন্দেহের চোখে দেখছে। আপনিই বলুন, এখন আমি কী করব?'

Scanned with CamScanner

আমাকে অবাক করে দিয়ে আন্টি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন। হয়তো আমার এত দিনের অবিচলতা দেখে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। এত দ্রুত দুআ কবুল হতে দেখে বুঝতে পারলাম, বিপদাপদে আল্লাহই একমাত্র সহায়। তিনি চাইলে অভাবিত স্থান থেকেও সহায়তা করতে পারেন। হাজারো রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করে দিতে পারেন তাঁর বান্দাদের জন্য।

আন্টি রাজি হয়ে যাওয়ায় আমি বাড়তি একটা সুযোগ পেয়েছিলাম। সেলাই কাজে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন তিনি। মহল্লার সবার মুখে মুখে তার দক্ষতার কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে বাসার লোকদের বললাম, 'আমি পাঠান আন্টির কাছ থেকে সেলাইয়ের কাজ শিখতে চাই।' তারা সানন্দে অনুমতি দিল। আর এভাবেই পেয়ে গেলাম কায়দা শেখার অভাবনীয় সুযোগ।

নীলম থেকে মারইয়াম

দেখতে দেখতে ছয়-ছয়টি মাস কেটে গেল। ছোট বোন নীলম সবসময় আমাকে সঙ্গ দেয়। এতে আমাদের দুজনেরই উপকার হচ্ছিল। আন্টির কাছে, বান্ধবীদের কাছ থেকে যা শিখে আসতাম, সেটা নীলমকেও শিখিয়ে দিতাম। আমার পাশে বসে ও নিজেও পড়ার চেষ্টা করত। আমি নিজের ঘরে সালাত পড়লে ও বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিত। কাউকে ঘরের আশেপাশে আসতে দেখলে সতর্ক করত আমাকে। আমার সমস্ত কর্মকাণ্ড লক্ষ করত মনোযোগ সহকারে। ভগবান ও মূর্তির ওপর থেকে ততদিনে ওর বিশ্বাস পুরোপুরি উঠে গেছে। কখনো কখনো তো আমাকে বলত, 'এই জঞ্জালগুলো কেন যে স্টোর রুমে সাজিয়ে রাখা হয়েছে! এগুলো আমাদের জন্য কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না! সবগুলো তুলে বাইরে ফেলে দেওয়া দরকার।'

নীলমের কথায় সায় দিতাম আমি। মনে মনে ভীষণ খুশিও হতাম। কিন্তু অনেক সময় মানুষ যা ভাবে, তা বাস্তবে করতে পারে না। আমরা এগুলোকে বাইরে ফেলার সামর্থ্য রাখি না। শান্তি এক জায়গাতেই—নীলমের অন্তরে আর এই মূর্তিগুলোর ঠাঁই নেই। স্টোর রুম থেকে না হোক, ও মূর্তিগুলোকে বের করে দিতে পেরেছে নিজের হৃদয় থেকে। ওকে বললাম ইসলাম গ্রহণ করে নিতে। আমি এখন আর এক মুহূর্তের জন্যও নীলমকে বিধর্মী ভাবতে পারি না।

আমার কথায় নীলম চমকে উঠল। দুঃস্বপ্ন দেখে মানুষ যেভাবে অকস্মাৎ ঘুম থেকে জেগে ওঠে, ওর অবস্থা অনেকটা সেরকমই হয়েছিল। তৎক্ষণাৎ আমাকে বলল, 'আমায় এক্ষুনি কালিমা পড়াও। কী জানি, কখন কার মৃত্যু চলে আসে!'

Scanned with CamScanner

'আল-হামদু লিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। আমি তো এত দিন এই মুহূর্তটির জন্যই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। বল—আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ।'

কালিমা পাঠ করানোর পর ওকে অর্থ জানালাম। কিছুটা ব্যাখ্যাও করলাম। এরপর বললাম, 'আজ থেকে তোর নাম মারইয়াম। তুই আমাকে আয়িশা ডাকবি আর আমি তোকে মারইয়াম।'

এদিকে দিনে দিনে ঘরের লোকজনদের কাছে আমাদের পরিবর্তনগুলো ধরা পড়তে শুরু করেছে। বিশেষ করে আম্মু তো আমাকে দুচোখে দেখতেই পারতেন না। প্রায় সময় মারইয়ামকে চুপি চুপি বোঝাতেন, 'মনিকার কোনো কথায় কান দিবি না। ও নিজে ডুবেছে, তোকেও ডোবাবে। না জানি তলে তলে ও কী করে বেড়াচ্ছে! মুসলিম মেয়েদের সাথে বন্ধুত্ব করে ও নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছে। আমি তো রোজ রোজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, হে ভগবান, কোনো একটা সম্বন্ধ এনে দাও। ওকে কারও হাতে গছিয়ে দিয়ে মাথার বোঝা হালকা করি।'

দ্বিতীয় সম্বন্ধ

আহা, কী তাকদির! মা ভগবানকে ডাকতেই সত্যি সত্যি আমার জন্য আরেকটা সম্বন্ধ চলে এলো। খুব অবাক হলাম। মায়ের প্রার্থনা এভাবে মঞ্জুর হয়ে গেল! তবে কি আল্লাহ আমাকে কঠিন কোনো পরীক্ষায় ফেলতে চাইছেন! আমার আবেগ, অবিচলতার পরীক্ষা নিতে চাইছেন! সাথে সাথে দুহাত তুলে দুআ করলাম, 'হে আল্লাহ, এক দুর্বল বান্দির পরীক্ষা যখন নিচ্ছ, তখন তাকে সহায়তা করো। অন্যথায় আমার সামর্থ্যই-বা কতটুকু! আমাকে উদ্ধার করো; পরীক্ষায় উতরে দাও। আমিন।'

বেশ ভালো সম্বন্ধ এসেছে এবার। এতটাই ভালো যে, সবাই বিনাবাক্যে রাজি হয়ে গেছে। আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। ছবি আদান-প্রদান পর্যন্ত সারা। একপক্ষকে অপরপক্ষের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করার ধুম পড়ে গেছে। ওই পক্ষের মহিলারা যখন তখন এসে আমাকে দেখে যাচ্ছে। এমনকি ছেলের আসা-যাওয়াও শুরু হয়ে গেছে। বলতে গেলে সম্বন্ধ পুরোপুরি পাক্কা! আমি আমার বোনদের কেঁদেকেটে বললাম, 'দিদি, এই মুহূর্তে আমি বিয়ে বসতে চাচ্ছি না। আমাকে আরেকটু পড়াশোনা করতে দাও।'

Scanned with CamScanner

আমার বড় বোন কমলা উত্তরে বলল, 'আরে ভাই, আমার তো ১৭ বছর বয়সেই বিয়ে হয়ে গেছে। তোর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, এতদূর পড়তে পেরেছিস। সম্বন্ধ অনেক ভালো। এখন পিছিয়ে আসার কোনো সুযোগই নেই।'

দিনদিন আমার ওপর পরিবারের সবার চাপ বাড়তে লাগল। সবাই চাইছে, আমি যেন 'হ্যাঁ' বলে দিই। হায় আল্লাহ, আমি এখন কী করব! হিন্দু ছেলের সাথে মুসলিম মেয়ের বিয়ে হারাম। এখানে বিয়ে বসার চেয়ে আত্মহত্যা করাও ঢের ভালো। উপায়ান্তর না পেয়ে প্রিয় বান্ধবী আনআমকে ফোন করলাম। সালাম বিনিময়ের পর আনআম বলল, 'আয়িশা, আমি তোমার বিয়ের উড়ো খবর শুনলাম। খবরটা কতটুকু সত্যি, বলো তো?'

'সেই বিপদ থেকে বাঁচার জন্যই তো তোমাকে ফোন করলাম। বাবা বলতে গেলে সম্বন্ধ চূড়ান্ত করে ফেলেছেন। ঘরের কেউ আমার কথা শুনছে না। এখন তুমিই বলো, আমি কী করব? কীভাবে এই হারাম সম্বন্ধ মেনে নেব!'

আন'আম সায় দিল আমার কথায়, 'হ্যাঁ, এটা তো সুস্পষ্ট হারাম। যেকোনো মূল্যে সম্বন্ধ ফিরিয়ে দিতে হবে।'

'কিন্তু কীভাবে! বাবার কাছে অনুনয় করে বলেছি। বোনদের কেঁদেকেটে একাকার করে বলেছি। খাবার পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছি। ওদিকে মা যেকোনো মূল্যে এই ভজঘট পাকাতে উঠে-পড়ে লেগেছেন। সবকিছুর পেছনে তিনিই কলকাঠি নাড়ছেন। তড়িঘড়ি করে আমাকে বিদায় করতে চাইছেন আর কি। আমি কিছুতেই এ বিয়েতে বসব না। দরকার হলে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করব।'

'কী বলছ এসব! এক হারাম থেকে বাঁচতে অন্য হারামের আশ্রয় নেবে! তুমি জানো না, ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মহত্যা মহাপাপ? এ কাজ করলে তুমি দুনিয়াও হারাবে, আখিরাতও হারাবে! এরচেয়ে বরং আল্লাহর কাছে কেঁদেকেটে দুআ করো। তিনি তো সর্বশক্তিমান। অবশ্যই কোনো না কোনো পথ বের করে দেবেন তিনি। হতাশ হয়ো না প্লিজ। আল্লাহর ওপর আস্থা রাখো। পৃথিবীতে যার কেউ নেই, তার আল্লাহ আছেন।'

আনআমের সাথে কথা বলার পর অস্থির মনে কিছুটা স্থিরতা এলো। ওযু করে চাদর বিছিয়ে দু-রাকাত সালাত পড়লাম। এরপর হাত তুলে দুআ করলাম, 'হে পরওয়ারদেগার, আমি তোমাকে ভুলে গেলেও তুমি তো আমাকে ভোলোনি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে নাও।'

Scanned with CamScanner

এবারও দুআ কবুল হলো। সন্ধ্যায় বাবা ঘরে ফিরে এলেন। রাতের খাবারের পর শোয়ার ঘরে তলব করলেন সবাইকে। সেখানে আমি ছাড়া বাড়ির সবাই উপস্থিত। আমি জানতাম, আজ বাবা বিয়ের তারিখ চূড়ান্ত করবেন। এ জন্য নিজের বিছানায় শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলাম। কিছুক্ষণ পর মারইয়াম দৌড়ে এসে বলল, 'আয়িশা, আয়িশা, সম্বন্ধ বাতিল হয়ে গেছে। কত ভালো সম্বন্ধ ছিল। আমার তো দুঃখে কাঁদতে ইচ্ছে করছে!'

আমি বিছানা থেকে মাথা তুলে আল্লাহর শোকর আদায় করলাম। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'সত্যি করে বল তো, কীভাবে সম্বন্ধটা ভেঙে গেল।'

ও-ঘরে যা যা কথা হয়েছে, সব আমাকে খুলে বলল মারইয়াম—আজ করাচি থেকে বাবার বন্ধু এসেছিল। কুশল বিনিময়ের পর বাবা তার বন্ধুকে আমার বিয়ের কথা বললেন। তিনি সবটা শুনে বাধ সেধেছেন এই সম্বন্ধের ব্যাপারে। ছেলেকে তিনি খুব ভালো করে চেনেন। ছেলে মোটেও ভালো নয়। বন্ধুর কথা শুনে বাবাও ফোন করে 'না' করে দিয়েছেন পাত্রপক্ষকে।

'তবে আপু, মা কিন্তু এখনো আগ্রহী।' মারইয়াম বিছানায় উঠে বসেছে আমার পাশে। বেশ উৎসাহ নিয়ে আমাকে মায়ের প্রতিক্রিয়া শোনাচ্ছে, 'বাবার মুখে এ সংবাদ শুনে মা আকাশ থেকে পড়েছেন। বলেছেন, 'হায় হায়! তুমি এ কী করলে! এত ভালো সম্বন্ধ এক কথায়ই নাকচ করে দিলে! তোমার মেয়ের মতিগতি মোটেও ভালো না! যত দ্রুত পারো, ওকে বিয়ে দিয়ে দাও। আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে, ওর কারণে ছোট মেয়েটাও হয়তো নষ্ট হয়ে যাবে। এখন ওরা কেউ আমার কথা শোনে না। মনিকা চলে গেলে নীলম এমনিই ঠিক হয়ে যাবে'।'

'তারপর? বাবা কী বলল?'

'তারপর আর কী! বাবা মাকে থামিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, 'আশা, তুমি চুপ করো। আমার মেয়েদের ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ো না। তুমি যেমন বলছ, ওরা কখনোই তেমন নয়। তোমার কথায় আমি ওদের কুয়োয় ফেলে দিতে পারি না। এই সম্বন্ধ আমি ফিরিয়ে দেবো। এটাই শেষ কথা'।'

মারইয়ামের কাছ থেকে কথাগুলো শোনার সময় মনে হলো, আমার পুরো শরীর অবশ হয়ে আসছে। খুব বড় একটা অপরাধ করে ফেলেছি আমি। দুআর সাথে সাথে

Scanned with CamScanner

অভিযোগও করেছি। ক্ষণিকের ভাবাবেগে আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলাম আল্লাহর ওপর। তখন তাঁর ক্ষমার পরিধি বুঝতে পারিনি, যা কিনা এখন বুঝতে পারছি। নিজের সব ভুল স্বীকার করে কায়মনো বাক্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলাম। তিনি যদি ক্ষমা না করেন, তাহলে আমার যাবার জায়গা নেই।

কতক্ষণ সিজদায় পড়েছিলাম জানি না। মারইয়াম আমাকে টেনে তুলে বসাল। মুখের ওপর পানির গ্লাস তুলে দিল। একটু পর আমি শান্ত হয়ে আনআমকে ফোন করলাম। জানালাম—'সম্বন্ধ নাকচ হয়ে গেছে।'

'আমি তোমাকে বলেছিলাম না, আল্লাহর কাছে কেঁদেকেটে দুআ করো! সব ঠিক হয়ে যাবে। এবার দেখলে তো! যাক, এখন বিয়ে-ভাঙার আনন্দে আমাকে মিষ্টিমুখ করাও। আর শুকরিয়া আদায় করে নফল সালাত পড়ো। আর হ্যাঁ, তোমাকে আরেকটি কাজ করতে হবে। তুমি ওযু ও সালাতের যেসব পদ্ধতি ও মাসআলা শিখছ, সেগুলো একটা খাতায় টুকে রেখো। কখনো ভুলে গেলে খাতা দেখে সহজেই মনে করে নিতে পারবে।'

ওর কথামতো একটি খাতা সংগ্রহ করে তখন থেকেই ওযু, সালাত, সিয়াম ও যাকাত-সংক্রান্ত মাসআলা সেখানে টুকে রাখতে শুরু করলাম। কোথাও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস পেলে, সেটাও সযত্নে তুলে রাখতাম। আন্টি আমাকে যে-সকল বিষয় শেখাতেন, সেগুলোও।

সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। কিন্তু এরই মধ্যে একদিন বিপত্তি বেধে গেল। যেটাকে কুরআন শিক্ষার বাহানা বানিয়েছিলাম, সেটাই বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াল। একদিন ঘরের লোকজন আমাকে জেরা করতে শুরু করল, 'তুমি কি সত্যি সেলাই শেখো, নাকি অন্যকিছু করো? সেলাই শিখলে তো এতদিনে অনেক জামা বানিয়ে ফেলার কথা! তোমাকে তো একটা জামাও বানাতে দেখলাম না!'

আমি ওদের জেরার মুখে সেবারের মতো এটা-সেটা বলে পাশ কাটিয়ে গেলাম। পরবর্তী দিনগুলো আগের মতোই নিরুপদ্রব কেটে যেতে লাগল। এভাবে জীবনের বৃন্ত থেকে ঝরে গেল দশটি মাস।

Scanned with CamScanner

করাচির তিন নওমুসলিমা বোন

খাবার টেবিলে বড়ভাই গলার পারদ চড়িয়ে চ্যাঁচাচ্ছেন। ঘটনা বুঝতে দৌড়ে গেলাম।

'এই পত্রিকা আমাদের বাসায় এলো কী করে? কে এনেছে এটা?'

ভাইয়ার হাতে একটা পত্রিকার কাটিং। পত্রিকার নাম 'ইসলাম আখবার'। আমি জানি পত্রিকার কাটিংটা কী করে এসেছে। আমিনা যত্ন করে কেটে পাঠিয়েছিল আমাকে। খবরের শিরোনাম :

'তিন নওমুসলিমা বোনকে মাদরাসায় অবস্থানের অনুমতিপ্রদান সুপ্রিম কোর্টের'

এমন শিরোনাম দেখে ভাইয়ার রেগে যাওয়া অমূলক না। আমিনা আর আনআম যা দেয় সবসময় লুকিয়ে রাখি, কাকপক্ষীও টের পায় নয়। এবার যে কী করে কাগজটা খাবার টেবিলে পড়ে গেল!

ঢোক গিলে ভাইয়ার কাছে এগিয়ে গেলাম। নিজের বোকামি ঢাকতে কিছুই জানি না এমন ভঙ্গিতে বললাম, 'কী জানি কী করে এলো! কী লেখা আছে ওটাতে ভাইয়া?'

'কীসব আজেবাজে লেখা! এ ধরনের সংবাদ মানুষের মগজধোলাই করতে যথেষ্ট।'

বলতে বলতে ভাইয়া খবরের কাগজটা ছিঁড়ে বাইরে ফেলে দিলেন। তাকে ফেরানোর সাহস আমার ছিল না। খুব ইচ্ছে করছিল থামাই, কাগজটা নিজের কাছে এনে রাখি। কিন্তু ভাইয়াকে ঠেকানোর সাধ্য যে আমার নেই! মন বলছিল আমার পরিণতিও হয়তো এমন হবে। শীতল ভাইয়ের শীতল আচরণ আর মায়ের চিরাচরিত রাগ— সবকিছুই ইঙ্গিত দিচ্ছিল সামনে কঠিন সময়।

ওই তিন নওমুসলিম বোন ২০০৫ সালের ১৭ই অক্টোবর ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাদের ব্যাপারে যথেষ্ট তথ্য জোগাড় করেছিলাম। খবরটা নিয়ে আমি বেশ উৎসুক ছিলাম। নতুন অনেক কিছু জানতে পেরেছি। যেমন : এত দিন জানতাম নওমুসলিম মেয়েদের 'দারুল আমান' বা 'সেফটি হোম'-এ পাঠানো হয়। তাই তাদের মাদরাসায় পাঠানোর সংবাদ আমার জন্য একেবারে নতুন।

Scanned with CamScanner

শীতল ভাইয়া কাগজ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললে কী হবে, তার আগেই খবরটা আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। ওই তিন বোন ১৮ অক্টোবর 'তালিমুল কুরআন মনজুর কালোনি'র পরিচালক শাইখ শাব্বির আহমাদ উসমানি সাহেবের কাছে ইসলাম গ্রহণ করে। তারা নিজেদের হলফনামা দিয়েছিল দক্ষিণ সিটি কোর্টে উপস্থিত হয়ে, সিভিল জজ জুলফিকার আলির সামনে। তারাই সে-সময় ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের জন্য মহিলা মাদরাসায় থাকার অনুমতি চায়। সিভিল জজ তাদের সেই আবেদন মঞ্জুর করেন। পরবর্তী কার্যক্রমে জেলা জজও তার ওই সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন। এরপর এই মামলাটি ওঠানো হয় উচ্চ আদালতে। ইসলামাবাদে এর দুইটি শুনানি হয়। ফলে তিন বোনকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সেফটি হোমে। তৃতীয় শুনানি হয় করাচিতে। সেখানে জাস্টিস হামিদ আলি মির্জাসহ অন্যান্য বিচারপতি তাদের মাদরাসায় অবস্থানের অনুমতি মঞ্জুর করেন।

এই মামলার সব তথ্য সংগ্রহ করার পেছনে আমার এক অদ্ভুত কৌতূহল কাজ করছিল। যতবার এ সম্পর্কে পড়েছি, মনে হচ্ছিল নিজের ভাগ্য সম্পর্কে আগাম ধারণা লাভ করছি। সামনে কী ঘটতে যাচ্ছে কিছুই তো জানি না। খুব সতর্কতার সাথে মেপে মেপে পদক্ষেপ নিতে হবে আমাকে। আমি একা নই, আমার সাথে ছোটবোন মারইয়ামও আছে!

রামাদানুল মুবারক

দশ মাস হলো, আমি মুসলিম হয়েছি। মারইয়ামের তত দিনে ছয় মাস হয়ে গেছে। আমরা একজন আরেকজনকে পাহারাদার বানিয়ে সালাত আদায় করি এখন। মাঝে মাঝে এমন হয়, বাসায় বাবাসহ ভাইয়ারা আছে। তখন মাগরিবের সালাতটা কাযা করা ছাড়া উপায় থাকে না। এ অবস্থায় ইশারায় ফরয আদায় করে নিই আমি। এরপর সুযোগ হলে কাযা সালাত আদায় করি।

ওদিকে বেচারি মারইয়াম ভয়ের চোটে কিছুই করার সাহস পায় না। পরে কোনো একসময়ে কাযা পড়ে নেয়।

কখনো কখনো এমন হয়—বাইরে আযান হচ্ছে, আর ঘরে শীতল ভাইয়া টেপ রেকর্ডার প্লে করে হাই ভলিউমে গান বাজাচ্ছেন। প্রথম প্রথম আমি কোনো রা করতাম না। কিন্তু কত দিন আর সহ্য করা যায়। মন বারে বারেই বিদ্রোহ করে। সালাতের আহ্বানে একটা বাড়িতে হাই ভলিউমে গান! আর কেউ মানলে মানুক, মুসলিম হয়ে কী করে মেনে নিই আমি?

Scanned with CamScanner

যেদিন ভাইয়ের উৎপাত সহ্যের বাইরে চলে যেত, সেদিন রীতিমতো ঝগড়া বাঁধিয়ে ফেলতাম। বলতাম, 'আযানের সময় এসব গানবাদ্য বাজিয়ো না। একটু সাউন্ড তো কমিয়ে দিতে পারো।'

আমার মেজো ভাই গুড্ডু একদিন আমাকে খুব করে ঝাড়ল।

'এই আযানের সাথে তোর এত ভালোবাসা কেন! প্রায়ই দেখি, আযানের সময় তুই একটা না একটা ঝগড়া বাধিয়ে দিস। এটা মুসলিমদের বুলি। আর গান আমাদের বুলি। আমরা যা ইচ্ছে করব। আমরা কি আযানের কারণে কোনো দিন তাদের থামিয়ে দিয়েছি? বলেছি, অসময়ে কেন আমাদের ডিস্টার্ব করা হচ্ছে?'

আমি নিরুত্তর। মনের ভেতর যে ঝড় বয়ে চলছে তা ভাইয়ারা বুঝবে না। আমি তখন মনে মনে বললাম, 'উফ, আর সহ্য হয় না। আল্লাহ, ওদের হিদায়াত দাও। কমপক্ষে এতটুকু অনুভূতি দাও, যাতে তারা বুঝতে পারে আযান স্রেফ মুসলিমদের বুলি নয়, এটা তোমার পক্ষ থেকে আহ্বান।'

অন্য অনেক দুআর মতো এই দুআটাও কবুল হয়ে গেল। আমার ১৩ বছর বয়সি ছোট ভাই দীপক এসে বলল, 'দিদি, তুমি রাগ করো না। আমি ভলিউম কমিয়ে দিচ্ছি।' এই ঝগড়াগুলো রোজই ঘটছিল।

এরপর চলে এলো রামাদান মাস। আমার মুসলিম বান্ধবীরা ফোন করে অভিনন্দন জানাল আমাকে। মারইয়াম নামের এক বান্ধবী আমাকে সাহরি পাঠানোর প্রস্তাব দিল। আসলে ও কৌশলে আমাকে সাহরির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিল।

আমাদের পক্ষে কি আর সাহরির কথা ভোলা সম্ভব! শুকরিয়া আদায় করলাম আমি। রাতের খাবার থেকে খানিকটা বাঁচিয়ে ফ্রিজে রেখে দিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য—সেই খাবার খাওয়ার সৌভাগ্য আর হলো না। বাবার ডায়বেটিস ছিল। রাতে বারবার জেগে যান, বাইরে এসে পানি পান করে পায়চারি করেন। আমরা সাহরির সময় ঘুম থেকে উঠে নিঃশব্দে পানি পান করে সিয়ামের নিয়ত করলাম, আল-হামদু লিল্লাহ। এভাবে দশ-পনেরোটি সিয়াম রেখে ফেললাম নির্বিঘ্নে। এই দিনগুলোতে এক-আধ বার ভাইয়াদের সাথে কথা কাটাকাটিও হয়েছিল। একদিন তারা আপত্তি তুলে বলল, 'তোরা কেন প্রতিদিন সিয়াম রাখিস!'

Scanned with CamScanner

উত্তরে আমি বললাম, 'মা-ও তো সিয়াম রাখে। মা ছাড়াও ঘরের আরও অনেকেই উপবাস করে। তুমিও তো রাখো। মসজিদে গিয়ে সালাত-কিয়ামও করো। কখনো কি আমরা এ নিয়ে আপত্তি তুলেছি! মাঝে মাঝে বাবার কাছ থেকে লুকিয়ে তোমাদের জন্য দরজাও খুলে দিয়েছি। এরপরও কেন তোমরা আমাদের সিয়ামের ব্যাপারে আপত্তি করছ!'

এমন সময় গুড্ডু বলল, 'আম্মু তো মুসলিমদের সিয়াম রাখেন না। আমাদের ধর্ম অনুসারে উপবাস করেন। আর আমাদের সিয়াম তো স্রেফ বন্ধুদের সাথে ইনজয়ের জন্য।'

গুড্ডু ছিল এ ঘরে আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। তার সাথে আমার অনেক কিছু মিলে যেত। এ জন্য তার এই উত্তর শুনে আমি থেমে গেলাম। আগ বাড়িয়ে কিছু বললাম না। আমি সবসময় ঘরের লোকজনের পাশাপাশি নাম ধরে গুড্ডুর হিদায়াতের জন্য দুআ করতাম। এখনো করি। আল্লাহ যেন আমার ভাইকে হিদায়াত দান করেন।

সেদিন গুড্ডু আর শীতল ভাইয়ের হাত থেকে পার পেয়ে গেলেও একদিন সিয়াম ভাঙতেই হলো। ঝামেলাটা বাধিয়েছিল দীপক। নাশতার টেবিলে বসে রীতিমতো তুলকালাম। চিৎকারে বাড়ি মাথায় তুলে ফেলেছে।

'বাবা, জানো? মনিকা আর নীলম দিদি আজ সিয়াম রেখেছে।'

'তুমি জানলে কী করে?' নিরাসক্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন বাবা। প্রথমে তেমন একটা পাত্তা দেননি। কিন্তু দীপক নাছোড়বান্দা। বাবাকে বিশ্বাস করিয়েই ছাড়বে।

দীপক বলল, 'কী কারণে যেন আমি রাতে জেগে গিয়েছিলাম। তখন দেখতে পেলাম, ওরা দুজন খাবার খাচ্ছে।' বাবা তখন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মা মনিকা, কী হয়েছে? সত্যি কি তোরা সিয়াম রেখেছিস?'

আমি বললাম, 'না বাবা, দীপক মিথ্যা বলছে। রাতে ক্ষুধা পেয়েছিল বলে দু-চারটে খেয়েছিলাম।'

দীপক তখন আমার দিকে পানির গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বলল, 'তাহলে এই পানিটুকু খেয়ে দেখাও তো।'

Scanned with CamScanner

বাবা দীপককে থামিয়ে দিলেন, 'দীপক, বোনদের পেছনে লেগো না। সবাই এসো, আমার সাথে নাশতা করবে। আমি এখনই কাজে বের হবো। ফিরব পনেরো দিন পরে।'

আমি আর মারইয়াম পড়লাম বিপাকে। দুজনই বললাম, আমাদের ক্ষুধা নেই। বাবা যেন এখনই নাশতা করে নেয়। আমরা পরে খেয়ে নিব।

ততক্ষণে বাবার মনে সন্দেহ দানা বেঁধেছে। দীপকের জেদ বাবাকে বিশ্বাস করিয়ে ফেলেছিল আমরা আসলেই সিয়াম রেখেছি। তাই বাবা বললেন, 'এটা কেমন কথা! আমার সাথে অবশ্যই তোদের দুই লোকমা খেতে হবে।'

অগত্যা বাবার সাথে আমরা নাশতা করতে বসলাম। পরিস্থিতির শিকার হয়ে সিয়াম ভেঙে ফেললাম। সেটা যে কী কষ্টের অনুভূতি ছিল তা বলে বোঝানো সম্ভব না। বুকের ভেতরে যেন রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিলাম—কেন সতর্ক হলাম না! দীপককে এড়িয়ে কেন সাহরি খেলাম না! একটা দলা পাকানো কষ্ট তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল সর্বক্ষণ।

শুরু হলো পরীক্ষা

একদিনের সিয়াম ভঙ্গ ছাড়া, বাকি রামাদান ভালোভাবেই কেটে গেল। ঈদুল ফিতর পালন করলাম নিজেদের মতো করে। সেলাইয়ের বাহানায় অল্পবিস্তর দ্বীনও শিখে যাচ্ছিলাম। আর ঘরের দরজা বন্ধ করে তাহাজ্জুদের সালাতও আদায় করা হচ্ছিল রাতের অন্ধকারে। আল্লাহর অশেষ রহমতে ফরয সালাত কাযা করতে হয়নি আমার। খুব বিপদে পড়লে অন্তত ইশারায় হলেও সালাত আদায় করেছি।

ইসলামগ্রহণের পর আমাদের দ্বিতীয় বছর শুরু হলো। আনআম ও আমিনা নতুন বছরের শুরুতেই আমাদের মনে করিয়ে দিল, এই দ্বীনের জন্য অযাচিতভাবে অনেক জটিলতা ও পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। কাজেই আমরা যেন মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকি। সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের জীবনে যে বিপদ ও দুর্যোগ নেমে এসেছিল, আমাদের জীবনেও তার কিছু ছায়া পড়তেই পারে।

ওরা মনে না করিয়ে দিলেও এমন কিছুর জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলাম। ইশক আর মেশক কখনো লুকিয়ে রাখা যায় না। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা লুকানোর সাধ্য আমাদের নেই। ঘরের লোকেরা কখনোই কিছু আঁচ করতে পারবে না, এমনটা স্বপ্নেও ভাবি না; বরং তারা আঁচ করলে করণীয় কী তা-ই নিয়ে বিচলিত থাকি।

Scanned with CamScanner

২০০৭ সালের ১০ই মে। এক সপ্তাহের ছুটিতে বাবা আর ভাইয়ারা বাসায় এসেছেন। মারইয়াম তখন স্কুলে। দ্রুত ছুটি হয়ে যাওয়ায় সেদিন আমি দুপুর বারোটা বাজতেই কলেজ থেকে বাসায় চলে এলাম। রুমে ঢুকতেই প্রচণ্ড ভয় আমার শিরদাঁড়া বেয়ে নিচে নেমে গেল। বড় ভাইয়া আমার রুমে ঢুকে নোটখাতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছে। সেখানে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে টুকটাক নোট করতাম আমি।

শীতল ভাইয়ার চোখ থেকে যেন ক্রোধের আগুন ঠিকরে পড়ছে। রুমে পায়ের আওয়াজ শুনেই ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তেড়ে এলেন ভাইয়া। কোনো প্রকার ভূমিকা ছাড়াই ঠাসঠাস করে দুই গালে চড় বসিয়ে দিলেন।

'নির্লজ্জ মেয়ে কোথাকার, আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে বেড়াচ্ছ! পরিবারের মান-সম্মান মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছ! আগামীতে যদি বাড়ির বাইরে এক পা বের হও, তবে মনে রেখো, পৃথিবীতে আমার চেয়ে খারাপ কেউ হবে না।'

ততক্ষণে আমার জন্মদাত্রী মা-ও উপস্থিত হয়েছেন। তিনি বললেন, 'শীতল, আমি তো অনেক দিন ধরেই বলছি...এই মেয়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। তোমার বাবার প্রশ্রয়ে এত বাড় বেড়েছে। এবার নিজেরাই দেখে নাও।'

'মা, তুমি ওর কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দাও। ও যেন আজ থেকে ঘরের বাইরে এক পা-ও না ফেলে।'

এ কথা বলে বড় ভাইয়া গজরাতে গজরাতে আম্মুকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় কিছুক্ষণ ঝিম ধরে খাটের ওপর বসে রইলাম। এরপর উঠে ওয়াশরুমে গেলাম। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলাম, গালের দু-পাশে হাতের চার-চারটি আঙ্গুলের দাগ বসে গিয়েছে। খানিক আগে আমার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড়ের আলামত। কিন্তু ঘটনাটা নিয়ে আমার মাঝে কোনো অনুশোচনা বা অস্থিরতার ছিটেফোঁটাও ছিল না। মনে হচ্ছিল এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা; বরং এর চেয়েও খারাপ কিছু ঘটতে পারত।

সন্ধ্যার দিকে লক্ষ করলাম, পুরো বাড়িতে থমথমে পরিবেশ। মারইয়াম স্কুল থেকে ফেরার পর ওকে পুরো ঘটনা শোনালাম। ওর মুখেও নেমে এলো বিষাদের ছায়া। বলল, 'ভাইয়া জীবনে এই প্রথম তোমার গায়ে হাত তুলেছে। আমার ভয় হচ্ছে, সামনে না জানি কী হয়!'

Scanned with CamScanner

আমিও তখন একই ভয় করছিলাম। কিন্তু মারইয়ামের সামনে প্রকাশ করতে মন সায় দিচ্ছিল না। এতে ও আরও ঘাবড়ে যেতে পারে; মনটাও ভেঙে যেতে পারে।

সন্ধ্যার খানিক আগে, সম্ভবত ৫টায় বাবা আমার রুমে এলেন। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। এরপর বললেন, 'মা, আমার খুব আফসোস হচ্ছে! শীতল কেন যে তোর গায়ে হাত তুলতে গেল! তবে আমি যেসব কথা শুনতে পাচ্ছি, তুই সেগুলো নিয়ে আবার ভেবে দেখ। কোনো ভুল পদক্ষেপ নিস না। তোকে নিয়ে আমি গর্ব করি। ভাইদের উত্তেজিত হওয়ার সুযোগ দিস না। এরকম হতে থাকলে বাড়িতে দুর্যোগ নেমে আসবে। তুই তো তোর মাকে ভালো করেই জানিস।'

আমার দুচোখে তখন অসহায়ত্বের অশ্রু। কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে বাবার পায়ের ওপর পড়েছে। বাবা দেখেও না দেখার ভান করলেন। কথা শেষ হওয়ামাত্র চলে গেলেন ঘর থেকে।

আমি মারইয়ামকে দরজা বন্ধ করতে বলে ওযু করতে চলে গেলাম। এরপর পরিষ্কার চাদর বিছিয়ে দু-রাকাত সালাত আদায় করলাম। হৃদয়ের সবটুকু আবেগ ঢেলে প্রার্থনা করে বললাম, 'ও আল্লাহ, আমি তো জানি তোমার দ্বীনের জন্য এইটুকু কষ্ট একেবারেই সামান্য। বরং আমি এই দ্বীনের জন্য জীবন পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত। আমি তোমার দুর্বল বান্দি। তুমি ছাড়া কে আমাকে অবিচল রাখবে এই দ্বীনের পথে? তুমি ছাড়া কে-ই বা আমার সহায় হবে? আমার দ্বীনের হিফাযত করো, আল্লাহ। আমার মনকে দৃঢ় করে দাও তোমার দ্বীনের ওপর।'

এরপর বেশ কিছুদিন পেরিয়ে গেছে। ওই দিনের পর থেকে পাঠান আন্টি ও মুসলিম বান্ধবীদের বাসায় আমার যাতায়াত পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল। টেলিফোনের ব্যবহারও নিষিদ্ধ। বান্ধবীদের সাথে ফোনে কথা বলার বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। তারপরও আল্লাহর অশেষ রহমত, আমার জন্য তখনো কলেজে যাওয়ার অনুমতি ছিল। কিন্তু সেখানেও হিন্দু মেয়েদের কারণে সবসময় সন্ত্রস্ত আর সতর্ক থাকতে হতো।

অনন্যোপায় হয়ে আমি তখন সিদ্ধান্ত নিলাম, এত দিন আন্টির কাছে যা শিখেছি, তা ঘরে বসে বারবার রিভাইস দেবো। কিন্তু এই রুটিন অনুসরণ করতে গিয়ে বিপত্তি বাধল। মা আমার ঠোঁট নাড়া আর দরজা বন্ধ রাখাও সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন। বাইরে থেকে যখন-তখন আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করতেন, 'কী করছ? কার সাথে কথা বলছ?'

Scanned with CamScanner

একদিনের ঘটনা। আমি আর মারইয়াম পরস্পরকে সুরা শোনাচ্ছি। এমন সময় আম্মু বাইরে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কার সাথে কথা বলছ?' আমি উত্তরে বললাম, 'কারও সাথে না, মা। নীলমকে আজকের ক্লাসের পড়াটা বোঝাচ্ছি। সন্দেহ হলে তুমি নিজেই এসে দেখে যাও।'

মা যেন এতক্ষণ আমাদের রুমে ঢোকার অজুহাত খুঁজছিলেন। ঘরে সন্দেহজনক কিছু আছে কি না, তা নিজেই সন্ধান করে বের করতে চাচ্ছিলেন। আমার উত্তর শোনামাত্রই তিনি রুমে ঢুকে আলমারির দিকে এগিয়ে গেলেন। অবস্থা বেগতিক। বুকের ধুকপুকানি বাইরে থেকেই শুনতে পাচ্ছি যেন। কী করব বুঝতে পারছিলাম না। মারইয়াম তৎক্ষণাৎ বলে বসল, 'মা, আমাদের আলমারি ছোঁবে না কিন্তু। তুমি এসে আমাদের কাপড়-চোপড়, জিনিসপত্র এলোমেলো করে রাখো। এগুলো গোছাতে প্রচুর সময় লাগে।'

মা মনের অনুভূতি বাঁকা হাসির আড়ালে লুকিয়ে বললেন, 'না রে সোনা, আমি কিছু করব না। তোমাদের আলমারিটা একটু গুছিয়ে রাখব শুধু।'

মারইয়াম আম্মুকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমার কষ্ট করতে হবে না। মনিকা দিদিকে সাথে নিয়ে আমিই গোছাতে পারব।'

মা তখন আলমারি থেকে ফিরে এসে বিছানায় বসলেন। কিছুক্ষণ সময় নিয়ে মনটা নরম করলেন। এরপর কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বললেন, 'তোমরা রুমের ভেতরে কী করো! আমি তোমাদের মা। আমার কাছে গোপন কোরো না। কোনো সমস্যা থাকলে আমাকে বলো। আমি সাহায্য করব। আমি তো চাই, আমার সন্তানরা সবসময় আমার কাছাকাছি থাকুক। এ নিয়ে আমার মনে অনেক কষ্ট। তোমরা যদি আমাকে আপন মনে করতে! তোমাদের সুবিধা-অসুবিধা আমার সাথে শেয়ার করতে!'

কথাগুলো বলার সময় মায়ের চোখ থেকে টপটপ করে অশ্রু ঝরতে লাগল। মন ভীষণ চুপসে গেল আমার। আসলেই তো মাকে ছেড়ে সবসময় দূরে দূরে থেকেছি। তার কি কষ্ট লাগতে পারে না? আমি দুই বাহু দিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরলাম। বললাম, 'মা, আমাদের ক্ষমা করে দাও। আমরা আসলেই তোমার কাছ থেকে দূরে দূরে থেকে ভুল করেছি। আর কখনো এমনটা করব না। আমরা দু-বোন সবসময় তোমার হয়ে থাকব। সত্যিই আমাদের জীবনে তোমাকে অনেক প্রয়োজন।'

Scanned with CamScanner

'মনিকা, মামণি আমার!' বলে মা আমাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। মারইয়াম তখন আমাদের দুজনকে ভালোবাসামাখা চোখে দেখছিল। সেদিনের পর থেকে আমাদের সাথে মায়ের আচরণ খুব কোমল হয়ে গেল। আমরা যেন মাকে নতুন করে চিনতে শুরু করলাম। আসলে এতদিন তাকে একটু হেলাফেলাই করেছি। ভেবেছি মা-ই সংসারের সব অশান্তির মূল। অথচ এখন তিনি মাঝেমাঝে আমাদের কাছে মুসলমানদের কিছু বিষয় নিয়ে প্রশংসাও করেন। তার সাথে আমরা একটু কোমল আচরণ করলেই হয়তো আরও আগে আমাদের বুকে টেনে নিতেন।

প্রতারণা

আজকাল মা প্রায়ই আমাদের রুমে আসেন। এটা ওটা নিয়ে নানান গল্প করেন। একদিন কথাচ্ছলে আনআম আর আমিনার প্রশংসা করলেন খুব। বললেন, 'ওরা খুব ভালো মেয়ে। অনেক দিন হলো আমাদের বাসায় আসে না। কারণ কী হতে পারে, বলো তো?'

আমি সায় দিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, অনেক দিন হলো, ওদের সাথে দেখা হয় না। আনআমের কথা না হয় বাদ দিলাম; ওর বাসা তো অনেক দূরে। কিন্তু আমিনা তো চাইলে আসতে পারে। মা, তুমি অনুমতি দিলে আমি আমিনাকে আসতে বলব।'

মা বললেন, 'ঠিক আছে।'

আমি লোক মারফত আমিনার কাছে সংবাদ পাঠালাম , 'মা তোমাকে স্মরণ করেছেন।' আমিনা বুধবার আসবে জানাল। আমি আম্মুকে জানালাম সে-কথা।

যথারীতি বুধবার আমিনা আমাদের বাসায় এলো। আমি ওকে আমার রুমে নিয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পর মা হঠাৎ করে রুমে প্রবেশ করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করছ তোমরা?' আমি ওই সময় দরজা না ভিড়িয়েই আমিনার কাছে আমপারা পড়ছিলাম।

মা কাছে এসে বললেন, 'দেখি তো, তোমরা কী পড়ছ?'

আমি বললাম, 'মা, তুমি অপবিত্র অবস্থায় এটা ধরতে পারবে না।'

'না, আমি এই মাত্র স্নান করে এসেছি।' এ কথা বলেই আমপারা কেড়ে নিয়ে লেখাগুলোর ওপর চোখ বুলাতে শুরু করলেন।

Scanned with CamScanner

ব্যস, আর যায় কোথায়? হাতে-নাতে ধরা। এবার মা আমার পুরো ঘর সার্চ করা শুরু করলেন। দরজার পেছনের অংশ, আলমারির ড্রয়ার থেকে শুরু করে সবকিছু তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলেন। এরপর আমপারা ছিঁড়ে দু-টুকরো করে ছুটলেন ভাইয়ার রুমের উদ্দেশে।

'শীতল, অ্যাই শীতল, দেখে যা। এত দিন তোরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছিস। আজ দেখ, মনিকার হাতে কী এসব!'

এ কথা বলে ছেঁড়া আমপারা শীতল ভাইয়ার হাতে তুলে দিলেন। ততক্ষণে আমিনাও বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ঘটনার আকস্মিকতায় তাকে ভীষণ অপ্রস্তুত দেখাচ্ছিল। আমি আমপারা উদ্ধার করার জন্য দ্রুত ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলাম। মায়ের চিৎকার শুনে শীতল তড়াক করে বেরিয়ে এলো। হাতে পিস্তল নিয়ে আমিনার সামনে এসে বলল, 'আমি প্রথমে ওকে গুলি করে মারব। এরপর তোকে নিজ হাতে খুন করব। এই মেয়ে আমাদের ঘরের শান্তি কেড়ে নিয়েছে। সবশেষে নিজেকে শ্যুট করে মরব।'

আমি চোখের ইশারায় মারইয়ামকে বোঝালাম ও যেন আমিনাকে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। এরপর ভাইয়াকে বললাম, 'ও তোমার কী ক্ষতি করেছে? রাগ ঝাড়তে চাইলে আমার ওপর ঝাড়ো। আমাকে গুলি করে মারো।'

'হ্যাঁ, আমি আজ তোরই দফারফা করব।' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ভাইয়া।

অবস্থা বেগতিক দেখে মা শীতল ভাইকে টেনে তার রুমে নিয়ে গেলেন।

কমলা দিদি

আমাদের বড় বোন কমলার বিয়ে হয়েছিল খুপড়ু জেলায়। আমাদের এখান থেকে দুই ঘণ্টার দূরত্ব। সাধারণত দু-তিন মাস পরপর চার সন্তানকে নিয়ে বেড়াতে আসত দিদি। মেয়ে তার বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসবে, এটাই তো স্বাভাবিক; কিন্তু তার এই বেড়ানোর দিনগুলো আমাদের জন্য খুব জটিলতার সৃষ্টি করত। সালাত আদায় করা কঠিন হয়ে পড়ত দিদির আগমনে। তবে এর মধ্যেও মহান আল্লাহ আমাদের সুযোগ করে দিতেন।

Scanned with CamScanner

মা মাঝেমধ্যেই কমলা দিদিকে নিয়ে প্রতিবেশী আর আত্মীয়দের বাড়িতে বেড়াতে যেতেন। তখন আমাদের দায়িত্ব থাকত দিদির সন্তানদের সামলে রাখা। দিদি আমাদের বাড়িতে এলে আমরা সবসময় এই সুযোগের অপেক্ষায় থাকতাম। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতাম। অন্তত সালাত আদায়ের সুযোগটা তো পাওয়া গেল! কিন্তু ভাগ্যের কী লিখন! এই সুযোগটাই অবশেষে আমাদের সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াল। দিদি আসার আগ পর্যন্ত পুরো ঘরের সবাই আমাদের সন্দেহের চোখে দেখলেও মজবুত কোনো প্রমাণ ছিল না। কেউ আমাদের শক্ত করে ধরতে পারছিল না। কিন্তু এবারের প্রমাণটা নিয়ে কারও মনে কোনো সন্দেহ রইল না।

কমলা দিদি সন্ধ্যার পর আম্মুকে সাথে নিয়ে এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। যাওয়ার সময় ছয় বছরের মেয়েটিকে রেখে গিয়েছিল আমাদের কাছে। ওদিকে মাগরিবের সময় শেষ হয়ে আসছে। তারা বাড়ির বাইরে পা ফেলতেই আমরা ভাগ্নিকে সাথে নিয়ে রুমের ভেতরে ঢুকে পড়লাম। সালাত আদায় করলাম চাদর বিছিয়ে। ভাগ্নি দূর থেকে আমাদের কাজ-কারবার দেখছিল।

এর কিছুদিন পরের ঘটনা। কমলা দিদি বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েছেন তিনদিন হলো। এ সময় হঠাৎ দিদির ফোন, 'মনিকা কোথায়? ওর সাথে কথা আছে।'

আমি এগিয়ে এসে রিসিভার কানে ধরতেই ওপাশ থেকে ঝাঁঝালো বাক্য এসে কানের পর্দা ঝলসে দিল যেন।

দিদি বলল, 'মনিকা, ঠিক কবে থেকে তোরা আমাকে ধোঁকা দিচ্ছিস বল তো? তোদের মুসলিম হওয়ার পাক্কা প্রমাণ আমার হাতে চলে এসেছে।'

আমি আকাশ থেকে পড়ার ভান করে বললাম, 'কী হয়েছে দিদি?'

'কী হয়নি আবার?'

'আরে বলবে তো, কী হয়েছে?'

'আমি কাল বাসায় এসে সব বলব।'

এ কথা বলে মুখের ওপর লাইন কেটে দিল দিদি। সাথে সাথে বুকের ভেতর ধকধকানি শুরু হয়ে গেল। ও আল্লাহ! এখন কী উপায়! দিদি কীভাবে জানতে পারল?

Scanned with CamScanner

পরদিন দিদি আমাদের বাড়িতে চলে এলো। ঘরের ভেতরে সবাই উপস্থিত—বাবা, ভাইয়া, মা, দিদি—সবাই।

সেখানে দিদি বলল, 'তোমাদের এখান থেকে শ্বশুরবাড়ি ফেরার পর দেখলাম, আমার ছয় বছরের মেয়ে 'মোহিনী' মাটির ওপর কাপড় বিছিয়ে সালাত পড়ার মতো করে হাত বেঁধেছে। এরপর কখনো রুকুতে যাচ্ছে, আবার কখনো সিজদায় মাথা নোয়াচ্ছে। আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'মোহিনী, এমন করছ কেন?' মোহিনী অবলীলায় বলল, 'আম্মু, আমি সালাত পড়ছি।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাকে এগুলো কে শিখিয়েছে?' বলল, 'আমি মনিকা আন্টিকে এভাবে সালাত পড়তে দেখেছি। আজ থেকে আমিও এভাবে সালাত পড়ব।'

এতটুকু শুনতেই মেজো ভাইয়ার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। ছুটে এসে আমার চুল ধরে টেনে নিয়ে ঘরের দেয়ালের সাথে সজোরে মাথা ঠুকে দিল। সবার সামনে শরীরের পুরো শক্তি দিয়ে আমার গালে এমনভাবে ঘুষি মারতে লাগল সমানে। দরদর করে রক্ত পড়ছে আমার নাক-মুখ বেয়ে।

সেখানে আমার দুলাভাইও ছিলেন। সবার সামনে আমাকে এভাবে মারধর করা হলো, কেউ বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করল না। মনের কষ্টে সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা বাবার রুমে চলে গেলাম আমি। বাবা ঘুমের বড়ি খান নিয়মিত। এক পাতা বড়ি নিয়ে চলে এলাম নিজের রুমে। দশটির মতো বড়ি ছিল। সবগুলো বড়ি খুলে এক গ্লাস পানি দিয়ে ঢকঢক করে গিলে ফেললাম। আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন। চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। আমার নাক বেয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছিল। কেবল এতটুকু স্মৃতিই মনে আছে।

হাসপাতালে

দুদিন পর নিজেকে আবিষ্কার করলাম হাসপাতালের বেডে। খানিকটা ধাতস্থ হয়ে চারপাশে চোখ বুলালাম। দেখলাম বাবা বসে আছেন বেডের পাশে। আমার জ্ঞান ফেরার অপেক্ষা করছেন। চোখ মেলতে দেখে তিনি বললেন, 'এখন কেমন আছিস মা? কেন এ কাজ করতে গেলি?'

আমার দুচোখ বেয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। বললাম, 'পারলে আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো। আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি।' শব্দ করে কাঁদতে লাগলাম। বাবাও কাঁদছেন। আবারও বললাম, 'বাবা, অন্তত তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও প্লিজ।'

Scanned with CamScanner

'মনিকা, আমি আমার সন্তানদের মধ্যে তোকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। তুই আমার গৌরব। তুই আমার সম্মান। প্লিজ, আমাকে ধোঁকা দিস না। তুই-ই আমার ছেলে। ঘরের ছেলেদের কাছে আমার এক রত্তিও চাওয়া নেই। আজ আমি তোকে বলছি, আত্মহত্যা মহাপাপের কাজ। আর কখনোই এমন কাজ করিস না, মা।'

সুস্থ হতে আরও কয়েকটা দিন পেরিয়ে গেল। শুরু হলো কলেজে যাওয়া-আসা। সুযোগমতো একদিন আনআম আর আমিনার সাথে দেখা করলাম। ওরা আমাকে শাসাল ভীষণ।

'এটা কোন ধরনের ধার্মিকতা? তুমি কি জানো না, ইসলামে আত্মহত্যা হারাম; মহাপাপ! কাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তুমি এ কাজ করতে গেলে? আল্লাহ চাননি যে, তুমি জাহান্নামের আগুনে পুড়ে ছাই হও। এ জন্য এবারের মতো রক্ষা করেছেন। তুমি আসলেই একটা পাগল। নিজের সমস্ত মেহনতের পুঁজি নষ্ট করার এই ভাবনা তোমার মাথায় কীভাবে এলো!' আনআমের গলায় স্পষ্ট ভর্ৎসনা।

আমিনাও আমাকে একটু আড়ালে নিয়ে বলল, 'দেখো, আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম, দ্বীন হচ্ছে ত্যাগের নাম। তোমাকে একটা সময় অবশ্যই বাড়ি ছাড়তে হবে। কাজেই তুমি সেই দিনের জন্য এখন থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুতি নাও।'

কপালে ভাঁজ ফেলে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাকে ঘর ছাড়তে হবে? এটা কী করে সম্ভব! আমি তো আর ছেলে নই যে যেদিকে ইচ্ছে বেরিয়ে পড়ব।'

'হ্যাঁ আয়িশা, এমন সময় আসতেই পারে। এখন তোমার বাবা-মা তোমাকে বিয়ে দিতে উঠে পড়ে লাগবেন। কাজেই এখন থেকেই তুমি নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে থাকো। তোমার জীবনে এটাই সবচেয়ে কঠিন মুহূর্ত। আল্লাহর দয়া যদি তোমাকে সঙ্গ দেয়, তবে তোমার কোনো কষ্টই হবে না, ইন শা আল্লাহ।'

বাসায় ফিরলাম অনেকটা নেশাগ্রস্তের মতো ঢুলুঢুলু শরীরে। ক্ষুৎপিপাসার কোনো অনুভূতিই তখন কাজ করছিল না। সবসময় একটা দুর্ভাবনার কীট মাথার ভেতর কুটকুট করে চলেছে। হায় আল্লাহ, এখন আমার কী হবে? কোথায় যাব? অবলা মেয়ে আমি। না-জানি কোন ভুলে আমার গায়ে কলঙ্কের দাগ লেগে যায়!

হাসপাতাল থেকে ফেরার পর বাবার কাছে একটা সেলফোনের আবদার করেছিলাম। ভাইয়া আমাকে একেবারেই টেলিফোনে কথা বলতে দেন না। ওদিকে আম্মু আমার

Scanned with CamScanner

সব কথা আড়ি পেতে শোনার চেষ্টা করেন। কী জানি, কখন কীভাবে নতুন হাঙ্গামা বেধে যায়! বাবা তাই আমাকে একটা স্মার্ট ফোন কিনে দিলেন। সেই ফোন গোপনে বিক্রি করে দুইটা কম দামি ফিচার ফোন কিনলাম। একটা দিয়ে আমার মুসলিম বান্ধবীদের সাথে যোগাযোগ করতাম, আর অন্যটা দিয়ে আত্মীয়-স্বজন আর হিন্দু বান্ধবীদের সাথে। কারণ, ঘরের লোকজন আমার মোবাইলের কল লিস্ট চেক করত। কখন কার সাথে কথা বলি, কী কথা বলি, কার সাথে বার্তা বিনিময় করি—সবই দেখত। এমনকি ভাইয়াও অফিস থেকে মাঝে মাঝে আমাকে কল দিয়ে চেক করে আমার মোবাইল ব্যস্ত কি না।

আমার দিন কাটতে লাগল একের পর এক কৌশল অবলম্বন করে। মাঝে মাঝে খুব দুশ্চিন্তাও হতো। একদিন ফোনে আনআমের সাথে যোগাযোগ করে তার কাছে পুরো পরিস্থিতি তুলে ধরলাম। বললাম, 'আমিনা আমাকে ঘরছাড়ার পরামর্শ দিচ্ছে। বিষয়টা নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় আছি আমি। তুমিই বলো, আমার কী করা উচিত এখন?'

'ঘরছাড়ার বিষয়টি নিয়ে তুমি দুশ্চিন্তা করছ?'

'আরে বাবা, দুশ্চিন্তা কেন করব না? আমি একটা মেয়ে। বাইরের পরিবেশ-পরিস্থিতির কথা তুমি নিশ্চয়ই জানো। আমি কোথায় যাব? এই ঘর ছেড়ে কোথায় উঠব?'

'ঠিক আছে, ঘর ছেড়ো না তাহলে!'

'আনআম, প্লিজ আমাকে ভালো কোনো পরামর্শ দাও। পথ দেখাও। ঘরের হুলুস্থুল পরিস্থিতি আমার জীবন থেকে স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে। বারবার মনে হচ্ছে আমি আল্লাহ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছি।'

'তাহলে?'

'এমন পরিস্থিতিতে আমি কীভাবে ঘরদোর ছেড়ে বেরুব? কোথায় যাব? পালিয়ে গেলে তো মানুষ আমাকে নষ্টা ভাববে!'

'শোনো, হতাশ হতে নেই। হতাশ হওয়া কাফিরদের কাজ। তুমি কি মারইয়াম আলাইহাস সালামের ঘটনা ভুলে গেছ? যে আল্লাহর জন্য তুমি ঘর ছাড়বে, তিনি তোমাকে কোন যুক্তিতে একা ছেড়ে দেবেন! পাগলি কোথাকার, যাও, তোমার রবের সাথে পরামর্শ করো। তুমি তো জানো, কীভাবে রবের সাথে কথা বলতে হয়।'

Scanned with CamScanner

এটুকু বলেই লাইন কেটে দিল আনআম। অনেকক্ষণ পর্যন্ত শব্দহীন মোবাইল কানের সাথে চেপে রেখে ঠায় বসে রইলাম আমি।

কী করব আমি? মারইয়ামকে বলব? নাকি গোপন রাখব? সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সালাতে দাঁড়ালাম। যার জন্য ঘর ছাড়তে চাই, তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন।

সংকটে সংশয়ে

ভাইদের সেদিনের আচরণের পর থেকে মা-ও প্রকাশ্যে আমাদের বিরোধিতা শুরু করে দিয়েছেন। বোনদের ডেকে বলেছেন, 'মেয়ে-দুটোকে কোনো কবিরাজ বা ঋষির কাছে নিয়ে যেতে হবে। ওরা ভগবানের অবাধ্য হয়ে পড়েছে।'

পুরো মহল্লা ঘুরে ঘুরে আমাদের বদনাম চালাচ্ছেন মা। আমাদের ঘরে যে-ই আসছে, তার সামনেই কান্না করে বলছেন, 'আমার মেয়ে-দুটো মুসলিম হয়ে গেছে। রাতের বেলায় ওদের রুমে কাকে কাকে ডেকে আনে, জানি না। রুমের দরজা বন্ধ করে কীসব করে বেড়ায়!'

অথচ আমরা ভেতরে সালাত পড়ি, তাহাজ্জুদ আদায় করি। এমনকি গোয়ালার কাছ থেকে প্রতিদিন দুধ নেওয়ার জন্য যখন বাড়ির গেইটে যান, তার কাছেও বলছেন, 'যেখান থেকে পারো, ওদের জন্য তাবিজ-কবজ এনে দাও। ওরা একেবারে বখে গেছে!'

হিন্দু ধর্মে ব্রাহ্মণশ্রেণির কিছু লোক কালোজাদু জানে। মা এ ধরনের লোক খুঁজে বের করলেন আমাদের শায়েস্তা করবার জন্য। তাদের কালোজাদুর ধরন সম্পর্কে কিছুটা জানতাম। কবরস্থান থেকে কঙ্কাল তুলে এনে সেই কঙ্কাল পোড়াত তারা। এর সাথে পানি মিশিয়ে সেই তরল খেতে বাধ্য করত লোকদের। আবার কখনো কঙ্কালের ভস্ম পানিতে ভিজিয়ে প্রলেপ দিত মাথায়। কোনো হিন্দু মেয়ে ধর্মত্যাগ করলে বা কোনো মুসলিম ছেলের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে এসব জাদুকর ব্রাহ্মণকে ডেকে আনা হয়। মেয়েটিকে খুঁজে বের করা হয় তাদের সাহায্যে। এরপর সীমান্তের ওপারে নিয়ে গুম কিংবা কোনো হিন্দুর মাধ্যমে তার ইজ্জত লুণ্ঠন। আমরা বিষয়গুলো জানতাম। আমাদের চোখের সামনে এমন দু-তিনটে দুর্ঘটনা ঘটেছে।

মা সর্বশক্তি ব্যয় করে আমাদের ওপর কালোজাদু করা শুরু করলেন। রাতে আমরা যখন শুয়ে পড়ি, তখন রুমে এসে আমাদের চুলের ওপর পানি ছিটিয়ে দেন। কখনো আবার আঠা জাতীয় পদার্থ মেখে দেন। জলের ওপর ফুঁ দিয়ে বলেন, এগুলো আমার চোখের

Scanned with CamScanner

সামনে তোমাদের পান করতে হবে। আমরা বিসমিল্লাহ পড়ে দিব্যি সেগুলো ঢকঢক করে পান করে নিই। ভয় পাই না একদম, সমস্ত ক্ষমতা তো মহান আল্লাহর হাতে।

এসব ছাড়াও কথায় কথায় আমাদের বকাঝকা তো আছেই। প্রচণ্ড মারধর করেন আমাদের। গায়ে হাত তোলা তার নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। পান থেকে চুন খসলেই তার হাত উঠে যায়। বলতে গেলে, প্রতিদিনই মারধর করেন। অথচ সেদিনের ঘটনার কারণে বাবা ভাইয়াদের ওপর ভীষণ রুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমার প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের গায়ে হাত তোলার অনুমতি কে দিয়েছে তোমাদের?'

মায়ের বদৌলতে পুরো মিরপুরখাস জেলায় দুর্নাম ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের নিয়ে। হিন্দু ঘরানা থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসা বন্ধ। শহরজুড়ে আমাদের জড়িয়ে নানান গুজব। কথাগুলো এক মুখ থেকে বেরুতে না বেরুতেই অন্যদের মুখে ছড়িয়ে পড়ছে। অবশ্য আমাদের সামনাসামনি এসে কেউ কোনোদিন কোনো কথা বলেনি। অন্যদিকে মহল্লার মুসলিমদের কাছে আমাদের সম্মান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা আমাদের অসামান্য সম্মানের চোখে দেখেন। কিন্তু নীরব থাকেন পরিস্থিতির কারণে।

আমাদের সংকটের দিনগুলোও দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। নিশ্চয়ই এর মাঝেই কোনো কল্যাণ নিহিত আমাদের জন্য।

তৃতীয় সম্বন্ধ

আমার বাবা-মা ও ভাইয়ারা মনেপ্রাণে চাইত, আমাদের জন্য বিয়ের সম্বন্ধ আসুক। এই আপদ ঘর থেকে দূর করলেই বুঝি তারা হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। কিন্তু তাদেরই অব্যাহত কুৎসা রটনার কারণে সেই সুযোগ অনেকটাই বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা এলাকার হিন্দুদের চোখে রীতিমতো কলঙ্কিনী। এ জন্য সিদ্ধান্ত হলো বোনদের শ্বশুরবাড়ির এলাকা থেকে আমাদের জন্য পাত্র খোঁজা হবে।

আমার বড় বোনের শ্বশুরবাড়ির এক আত্মীয় থাকে করাচিতে। বোনের চেষ্টায় করাচি থেকে সম্বন্ধ এলো। খুবই ভালো সম্বন্ধ। ছেলে সম্ভবত ডাক্তার। পুরো ঘরে আনন্দের হিল্লোল পড়ে গেল। সবাই বাহবা জানাচ্ছে। এমনকি আমাকে না জানিয়েই সম্বন্ধ পাকা করে ফেলল, একটি বার জিজ্ঞেস করারও প্রয়োজন মনে করল না। আমাকে দিদির সাথে করাচি পাঠানো হলো। বলা হলো, 'যাও। ওখান থেকে বিয়ের মার্কেটিং করে এসো। তোমাদের মতো কাক-মেয়ে যে কোকিলের বউ হতে পারছে,

Scanned with CamScanner

সেটা আমাদের চৌদ্দ পুরুষের সৌভাগ্য।'

অগত্যা দিদির সাথে করাচি এলাম। দিদিকে হাতজোড় করে বললাম, 'অন্তত একটি বারের জন্য হলেও ছেলের মুখ দেখাও।'

মনে মনে ভেবে রেখেছিলাম, সাক্ষাতে ছেলের কাছে আমার মুসলিম হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরব। সেই সাথে তাকেও মুসলিম হওয়ার দাওয়াত দেবো।

কিন্তু আমার চিন্তাভাবনা আর কৌশল দিয়ে কি আর ভাগ্যের লিখন খণ্ডানো যায়! তাকদিরে যা লেখা আছে, সেটাই ঘটে। দিদি ছেলেকে ফোন করে আমাদের করাচি আসার সংবাদ জানালেন। রাত আটটায় আমরা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার পর দেখলাম, ছেলেটা গ্লাসের পর গ্লাস মদ গিলছে। নেশার কারণে সে এতটাই বেসামাল যে, দিদির দিকেও কামার্ত চোখে তাকাচ্ছে।

তাকদিরের কী চমৎকার খেল! সবকিছু নিজের চিন্তামাফিক হলেও হয়তো এত সুন্দর করে বিয়েটা ভেঙে যেত না। আমরা সেখানে ঘণ্টাখানেক থেকেই ফিরে এলাম। দিদি তখন লজ্জায়-অনুশোচনায় আড়ষ্ট। তার মুখে কোনো কথা ফুটছিল না। ঘরে ফিরে বাবার কাছে পুরো ঘটনা খুলে বলল। আম্মু তখন ফোড়ন কেটে বললেন, 'ছেলে মানুষ এক-দুই পেগ পান করলে ক্ষতি কী!'

বাবা তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি চুপ করো তো। আমি কখনোই কোনো মাতালের হাতে আমার মেয়েকে তুলে দেবো না।'

রুমে ফিরে সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম আমি। মহান রব এবারও আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন!

মারইয়ামের সাথে পরামর্শ

তৃতীয় সম্বন্ধের পর চিন্তা-ভাবনার গতিবেগ বেড়ে গেল আমার। এভাবে আর কত দিন! পরিস্থিতি যেভাবে বদলে যাচ্ছে, তাতে আমি আর কদিনই-বা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারব। আমার অজান্তে কত কিছুই তো ঘটে যেতে পারে। আল্লাহ যেহেতু আমাকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন, সেহেতু এর সদ্ব্যবহারও আমাকেই করতে হবে। প্রয়োজনীয় সাহস সঞ্চয় করতে হবে। এই ভাবনা থেকেই একদিন মারইয়ামকে বললাম—

Scanned with CamScanner

'মারইয়াম, এভাবে আর কত দিন চলবে? আল্লাহ তো আমাকে দীর্ঘ অবকাশ দিয়েছেন। এখন এই মুহূর্তে যদি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করি, তাহলে যেকোনো মুহূর্তে কোনো অপ্রিয় ঘটনা ঘটে যেতে পারে।'

'হ্যাঁ, পরিস্থিতি তো তেমনই। কিন্তু তুমি কী করবে, বলো'?

'তুই সঙ্গ দিলে কিছু একটা করতে পারি।'

'আমি তোমার জন্য কী করতে পারি?' মারইয়ামের কণ্ঠে সংশয়।

'চল, আমরা বাড়ি থেকে পালিয়ে যাই।'

মারইয়াম স্তব্ধ হয়ে গেল আমার কথায়। ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি এমন কিছু বলতে পারি আমি। কিছুক্ষণ থেমে বলল, 'কী বললে! পালিয়ে যাব? না না, এটা হতে পারে না। তুমি ঘর ছাড়তে পারবে না, আমিও পারব না। তারচেয়ে চলো, সুবোধ বালিকার মতো আমরা আমাদের বাপ-দাদার ধর্মে ফিরে যাই।'

আমি ওকে থামিয়ে দিলাম, 'না রে বোন, তোকে ফিরতে হলে আমার লাশের ওপর দিয়েই ফিরতে হবে। মুসলিম হওয়ার পর আমি তোর জীবন হিন্দুদের হাতে সঁপে দিতে পারি না; এমনকি তুই চাইলেও না। আমি কিছুতেই হারামের ওপর তোর মৃত্যু দেখতে পারব না। আখিরাতে আমাদের পালনকর্তার সামনে কোন মুখে দাঁড়াবি তুই? প্রয়োজন হলে আয়িশা হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করে নেবে; তবু কখনোই বাপ-দাদার ধর্মে ফিরে যাবে না। তোকেও ফিরতে দেবে না। মারইয়াম, বোন আমার, আমি যদি এই মুহূর্তে তোর চোখের সামনে মারা যাই, তবে কি তুই এই ঘর ত্যাগ করবি?'

'যে কাজ আমি এখন তোমার সামনেই করতে পারব না; সে-কাজ তোমার মৃত্যুর পর কীভাবে করব?'

'বোন রে, আমার জীবনের সহযাত্রী তুই। তুই যদি এই মুহূর্তে আমার সামনে মারা যাস, তবে আমি একমুহূর্তও কালবিলম্ব না করে আমার দ্বীনের জন্য, আমার আল্লাহর জন্য এই ঘর ছেড়ে চলে যাব। আমি এখন পর্যন্ত এই ঘরে পড়ে আছি শুধু তোর জন্য। আমি জানি না, আমার মঞ্জিল কোথায়। কিন্তু বিশ্বাস করি, আমি যাঁর জন্য এই ঘর ত্যাগ করব তিনিই আমার হিফাযত করবেন। এটা তাঁর অঙ্গীকার।'

Scanned with CamScanner

আমার দৃঢ়তা দেখে হাল ছেড়ে দিল মারইয়াম। বাঁধ-না-মানা অশ্রুতে কান্নায় ভেঙে পড়ল। জানি না, কী চলছে ওর মনের মধ্যে।

আমি ওর অশ্রু মুছে দিলাম। সালাতের ওয়াক্ত মনে করিয়ে দিলাম। এরপর ধীরে ধীরে ওকে বোঝালাম। বললাম, 'আয়, আল্লাহর কাছে দৃঢ়তা ও অবিচলতা প্রার্থনা করি। একবার সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে চেয়ে দেখ, কীভাবে আল্লাহ দুহাত ভরে দান করেন। কথাগুলো বলার সময় আমার চোখেও অশ্রু নেমে এলো। সেদিন দীর্ঘ সময় মাটিতে লুটিয়ে মহান আল্লাহর সিজদা করলাম।'

আমাদের সাথে, বিশেষ করে, আমার সাথে কোনো ভাই-ই কথা বলে না। ওদিকে মায়ের ক্ষোভের পারদ এখন তুঙ্গে। তার হাতের নখগুলো অনেক বড়। তিনি সবসময় আমাকে মারধরের ছুতো খুঁজে বেড়াচ্ছেন। বাহানা পেলে আমার মুখে নখ দিয়ে আঁচড় কেটে ক্ষতবিক্ষত করার চেষ্টা করেন। আমিও তার থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকার চেষ্টা করি। তিনি হাত বাড়ালেই কনুই বাড়িয়ে কোনোমতে আঘাত ঠেকানোর চেষ্টা করি। আমার দুই বাহু ও কনুইয়ে তার ধারাল নখের ক্ষতচিহ্নগুলো বয়ে বেড়াচ্ছি। মাঝে মাঝে রাতের বেলা শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতস্থানগুলোর ওপর আলতো করে হাত বুলিয়ে দিই। অন্ধকার রাতের আড়ালে হারিয়ে যায় আমার চোখ থেকে নেমে আসা তপ্ত অশ্রু।

বুকের বোঝা হালকা হলো

আমি সাধারণত রাত বারোটার পর আমিনার সাথে ফোনে কথা বলি। মাঝে মাঝে দিনের বেলায়ও বলি। বারবার মনে হয় আমার নিরাপত্তার বলয় যেন সংকুচিত হয়ে আসছে। খুব ভয় লাগে আজকাল। আমার বাড়ির লোকেরা দিনদিন আমার জন্য, আমার ঈমানের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তারা যেকোনো সময় যেকোনো ধরনের অঘটন ঘটাতে পারে। আমাকে ইসলাম থেকে বের করার জন্য করতে পারে জঘন্য থেকে জঘন্যতর কাজ। কিন্তু এত অনিশ্চয়তার পরও আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার সাহস পাচ্ছি না। নানারকম দুশ্চিন্তায় মন বিষিয়ে ওঠে।

এদিকে মা প্রতিদিন আমাকে মারেন। আমার গায়ে হাত তোলা যেন তার নেশায় পরিণত হয়েছে। আমাকে মারার জন্য কোনো না কোনো অজুহাত পেলেই হলো! কখনো কখনো অজুহাতেরও প্রয়োজন হয় না। কারণ ছাড়াই মারেন। মায়ের এই নিপীড়ন দিনদিন যেন বেড়েই চলছে। তার নির্যাতন এতটা বেড়ে গেছে যে, মাঝে

Scanned with CamScanner

মাঝে কমলা দিদি পর্যন্ত বলে, 'মা, এতটা বাড়াবাড়ি ঠিক না। তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছো!' দুলাভাইও একই কথা বলেন। দিদি-দুলাভাই প্রায়ই আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন। তারা নানাভাবে আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। আইসক্রিম খাওয়ার কথা বলে আমাকে বাড়ির বাইরে নিয়ে যান যাতে মা আমাকে মারতে না পারেন।

একদিন মা আমার চুলের মুঠি ধরে কাঁচি দিয়ে চুল কাটতে শুরু করলেন। প্রতিবাদ করতেই পিঠের ওপর দ্রিম দ্রিম কিল-ঘুসি পড়তে লাগল। মার খেয়ে নিথর হয়ে পড়ে রইলাম আমি। এমন সময় ঘরে ঢুকলেন দুলাভাই। আমাকে মাটি থেকে তুলে মুখের সামনে পানি ধরলেন। এরপর বললেন, 'বোন, তোমার তো অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত।' তার কথাটা আমার শরীরে যেন কাটার মতো বিঁধল। মনে হলো, অনেক আগে অনুভব করা সেই আলোটি মুহূর্তের জন্য আমার চোখের সামনে জ্বলে উঠছে। সাথে সাথে কানের মাঝে ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা সাইরেন বাজতে শুরু করল। আমার চিন্তাশক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে।

কিছুক্ষণ পর বিধ্বস্ত শরীরে রুমে এলাম। দরজা বন্ধ করে কল দিলাম আমিনাকে। সব ঘটনা জানিয়ে বললাম, 'আমি আর পারছি না। আমার জন্য কিছু একটা করো। আমি বাসা থেকে পালিয়ে যেতে চাই।'

আমিনা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এখন না। প্রথমে আমি আমার বাবার সাথে কথা বলে নিই। তার কাছ থেকে কারও ঠিকানা জোগাড় করে তোমাকে জানাচ্ছি। ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি সবর করো, বোন।'

'না না, বাসার কাউকে জানিয়ো না। তারা যদি আমার বাসার লোকদের বলে দেয়, তাহলে আমাকে মেরেই ফেলবে।'

'ঠিক আছে। বলব না। তবে আমাকে একটু সময় দাও। ভেবেচিন্তে দেখি কী করা যায়। এখন রাখি। আল্লাহ হাফিয। তুমি একটু ভালো মতো ঘুমিয়ে নাও। অনেক ধকল গেছে তোমার ওপর দিয়ে।'

আমি যে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে চাই সেটা আমিনা তার বাবাকে বলেনি। তবে বাড়িতে আমি যে ভয়াবহ পরিস্থিতি আর মারধরের শিকার হচ্ছি, সেটা তাকে জানাল। বলল, 'আমার বান্ধবী প্রকাশ্যে সালাত-সিয়াম করতে পারে না। কাউকে মুসলিম হওয়ার কথাও জানাতে পারে না। কথায় কথায় পরিবারের লোকেরা ওর

Scanned with CamScanner

ওপর টর্চার করে। তুমি যদি কোনো ভদ্র দ্বীনদার ব্যক্তির ঠিকানা বলে দিতে, তাহলে ওর একটা ভালো ব্যবস্থা করা যেত।'

ওর বাবা তখন ওকে শাইখ হাফিজুর রহমান সাহেবের খোঁজ দিলেন। তিনি মদিনা মসজিদের ইমাম। একজন আলিম, আর খুবই ভালো মানুষ। তার অনেকগুলো সাক্ষাৎকার স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় বেরিয়েছে। শোনা যায়, প্রায়ই একাধিক হিন্দু নারী-পুরুষ তার কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করে।'

আমিনা আমাকে শাইখ হাফিজুর রহমানের কথা জানাল। আমি বললাম, 'তিনি আসলেই অনেক ভদ্র ও দ্বীনদার কিনা সে ব্যাপারে ভালোভাবে খোঁজখবর নেওয়া দরকার। বোঝোই তো, আমাদের সাবধানে পা ফেলতে হবে। আরেকটা কথা, যেভাবে পারো, তার ফোন নম্বর জোগাড় করে দিয়ো, প্লিজ।'

আমিনা অনেক চেষ্টা-তদবির করে তার ভাইয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য জোগাড় করল। ফোন নম্বরও সংগ্রহ করল। আর আমাকে আশ্বস্ত করে বলল, 'আমি ভালোভাবে খোঁজ-খবর নিয়েছি। তিনি সত্যিই অনেক ভালো মানুষ। শহরের সব লোক তাকে সম্মান করে। এমনকি হিন্দুরাও তাকে মান্য করে। এই নাও শাইখের ফোন নম্বর। তার কাছে তোমার সমস্যাগুলো খুলে বলো। চিন্তা করো না, আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো। তিনি তোমাকে নিরাশ করবেন না, ইন শা আল্লাহ।'

আমিনার কাছ থেকে ফোন নম্বর নিয়ে ঠিক করলাম শাইখ হাফিজুর রহমানের সাথে কথা বলব। কিন্তু এখনো দ্বিধায় আছি। বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া ঠিক হবে তো? তারপরও আশা-আশঙ্কার মিশ্র অনুভূতি নিয়ে তার নম্বরে ডায়াল করলাম। নানারকম ভাবনা খেলা করছে মনের ভেতরে। ফোন করা কি ঠিক হচ্ছে? কী বলব আমি? বাড়ি থেকে পালাতে চাই? তিনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন? কিছুক্ষণের মধ্যে হাফিজ সাহেব কল রিসিভ করলেন।

'আস সালামু আলাইকুম। কে বলছেন?'

'জি, আমার নাম আয়িশা।'

'জি, বলুন।'

Scanned with CamScanner

'শাইখ, দুই বছর হলো আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমার ছোট বোনও ইসলাম গ্রহণ করেছে।

'মা শা আল্লাহ, আল-হামদু লিল্লাহ।'

'শাইখ, এখন পর্যন্ত আমরা বাবার বাড়িতেই আছি।'

'হুম, তাহলে তো আপনাদের বেশ ঝামেল পোহাতে হচ্ছে? পরিবারের লোকেরা নিশ্চয়ই বিষয়টি সহজভাবে নেয়নি।'

'জি, আমাদের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে যাচ্ছে। এ জন্যই আমরা আপনাকে কল দিয়েছি। এ মুহূর্তে আমরা কী করতে পারি?'

'বোন, দ্বীনের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, এই ত্যাগ বৃথা যায় না। আল্লাহ আপনাদের চলার পথ সহজ করে দিন।'

'জি, আমি ইবরাহিম আলাইহিস সালামের তাওয়াক্কুল ও কুরবানির ইতিহাস পড়েছি। অনেকগুলো ইসলামিক বইও পড়েছি, আল-হামদু লিল্লাহ। এখন আমরা বাধ্য হয়ে আপনার সাহায্য চাইছি। পরিবারের নিপীড়ন দিনদিন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।'

'আমি আপনাকে বোন ডেকেছি। ইন শা আল্লাহ, ভাই হিসেবে আমার দায়িত্ব আমি পালন করব। আপনি যখন চাইবেন, চলে আসবেন। আমার স্ত্রী আপনাকে সাদরে বরণ করে নেবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বীনের ওপর বরকতময় দৃঢ়তা দান করুন। আপনার যখনই দরকার হবে, এই নম্বরে ফোন করবেন। আল্লাহ হাফিয।'

শাইখের সাথে কথা বলার পর বুকের ওপর থেকে যেন বিশাল বোঝা নেমে গেল। নিজেকে অনেক হালকা লাগছে এখন। মনে হচ্ছে, আমি আমার বোঝা আমার বড় ভাইয়ের মাথায় তুলে দিয়েছি। তাই নিজেকে নিরাপদ ও নির্ভার লাগছে। এখন মারইয়ামও আমার পাশে চলে এসেছে। অথচ এত দিন ওকে নিয়েই বেশি চিন্তা হতো। ও নরম মনের মেয়ে। ভীতুও। আমি চিন্তায় ছিলাম, ও যদি ভয়ে দ্বীনের পথ থেকে ছিটকে পড়ে!

আমি মারইয়ামকে বলেছিলাম, 'আল্লাহর ওপর ভরসা কর। মনে সাহস রাখ। দুনিয়ার কাউকে ভয় পাস না। বাবা-মা, ভাই-বোন কাউকেই না। শুধু আল্লাহকে ভয় কর। ইসলাম ত্যাগ করে কুফরের পথে ফিরে যাস না। মনে রাখবি, দুনিয়ার

Scanned with CamScanner

এই জীবনের দুই পয়সা মূল্যও নেই। সবাই একদিন না একদিন মরে যাবে। দুনিয়ার জীবন শেষ হয়ে যাবে। দুনিয়ার কথা চিন্তা করে কী লাভ বল? আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করার মাঝে কোনো ফায়দা নেই। আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টির মাধ্যমে যে বস্তু পাওয়া যায়, সে বস্তু স্থায়ী নয়। তাই এই দুনিয়ার চিন্তা করিস না। আমাদের আখিরাতের কথা ভাবতে হবে। সেটাই হলো অনন্তকালের জীবন। পৃথিবীর জীবনের প্রতিটি কষ্টেরই শেষ আছে। কিন্তু পরকালীন জীবনের কষ্ট ও ভোগান্তির কোনো শেষ নেই। বল, সেই অনন্তকালের কষ্ট আমরা কীভাবে সহ্য করব? চল, এরচেয়ে বরং আমরা কোনোমতে দাঁত কামড়ে দুনিয়ার জীবনের কষ্টগুলো সহ্য করি।'

আল্লাহর ইচ্ছায় আমার এই কথাগুলো মারইয়ামের অন্তরে প্রবেশ করেছিল। আমরা এখন দুজনেই দুনিয়ার বিপদাপদ মোকাবেলার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমাদের অন্তর এতটাই প্রশান্ত হয়ে গেছে যে, ঘরের লোকজনের চিৎকার-চ্যাঁচামেচিও খারাপ লাগছে না। যেন মেঘের মতো হাওয়ায় ভাসছি। বাড়ি ছাড়ার দুশ্চিন্তাও আগের মতো ঘায়েল করতে পারছে না। আমরা এখন ঠান্ডা মাথায় একসঙ্গে শলাপরামর্শ করছি, কখন কোন উপায়ে ঘর থেকে পালাব। সে-সময় ঘরের লোকদের প্রতিক্রিয়া কী হবে। ভাইয়ারা কী ভাববেন, দুলাভাইরা কী ভাববেন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীরাই-বা কী বলবে। সমাজের চোখে বাবা-মায়ের অবস্থান কোথায় নামবে, হয়তো লজ্জায় তাদের মাথা হেঁট হয়ে যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। মানবিক দুর্বলতার কারণে কখনো কখনো এক-আধটু দুর্ভাবনা জড়ো হয় না তা নয়; কিন্তু খুব দ্রুতই কেটে যায় সেসব। আমরা মনের সবটুকু আবেগ জড়িয়ে আমাদের পরিবারের জন্য দুআ করছি—'হে আল্লাহ, আপনি তাদেরও হিদায়াত দান করুন। তাওহিদকে ধারণ করার জন্য তাদের অন্তর প্রশস্ত করে দিন। তাদেরও সিজদার মাধ্যমে হৃদয়ের প্রশান্তি লাভের তাওফিক দান করুন।'

ঠুনকো সামাজিকতার ঊর্ধ্বে উঠে সবকিছু নিয়ে চিন্তাভাবনা করছি এখন। রাতে যখন বিছানায় গা এলিয়ে দিই, তখন অজান্তেই এ জাতীয় ভাবনাগুলো চলে আসে। মাঝে মাঝে এ নিয়ে নানান রকম স্বপ্নও দেখি।

একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম, পরিবারের সদস্যদের সাথে গাড়িতে চড়ে কোথাও যাচ্ছি। আমার পাশের সিটে মারইয়াম বসে আছে। হুট করে গভীর জঙ্গলে আমাদের গাড়িটা নষ্ট হয়ে গেল। আমি আর মারইয়াম গাড়ি থেকে নেমে বাইরে এসে

Scanned with CamScanner

দাঁড়ালাম। ভয়ে তখন আমাদের বুক ধড়ফড় করছিল। হাত-পা কাঁপছিল। চারপাশে ঘন গাছপালা আর ঝোপঝাড়। প্রচণ্ড অন্ধকারের কারণে সবকিছু ঝাপসা দেখাচ্ছে। হঠাৎ লক্ষ করলাম, অনেক দূরে একটা ছোট্ট টিলা দেখা যাচ্ছে। সেই টিলার ওপর একটা বাড়ি। পুরো টিলায় একটাই বাড়ি। আশপাশে আর কোনো বাড়িঘর নেই। সেই বাড়ির ভেতর থেকে আলোর ছটা বাইরে বেরিয়ে আসছে। আমি তখন মারইয়ামের হাত ধরে সেই বাড়িটির দিকে দৌড়াতে শুরু করলাম।'

এতটুকু দেখেই ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু দৃশ্যগুলো আমার চোখ ও মন থেকে মুছে গেল না। বিছানায় শুয়ে সেই বাড়ির দৃশ্যগুলো মনে করতে লাগলাম। ঘুম থেকে জেগেও সব যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এমনও হতে পারে, এই স্বপ্নে আমাদের সামনের পদক্ষেপের প্রতি সমর্থন জানানো হয়েছে। এরকম আরও বহু উপায়ে মহান আল্লাহ তাঁর ইচ্ছে ও আমাদের করণীয় সম্পর্কে ধারণা দিয়ে থাকেন। কিন্তু আমরা খুব কম মানুষই সেগুলো বুঝতে পারি। দৈনন্দিন জীবনে কত ইঙ্গিতই-না আসে তাঁর পক্ষ থেকে। আমাদের দুআ, স্বপ্ন ও প্রাত্যহিক জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনাপ্রবাহের আড়ালে অনেক কিছুই তো ঢাকা পড়ে যায়। এই বিষয়টি বুঝতে আমার যথেষ্ট সময় লেগেছে। আমার ইসলাম-পূর্ব জীবন ছিল হাজারো প্রশ্নের ঝড়ে অস্থির। আল-হামদু লিল্লাহ, এখন সেই অস্থির জীবন থেকে বেরিয়ে এসে স্থিরতার তীরে পৌঁছাতে পেরেছি।

সফরের প্রস্তুতি

মাত্র ইন্টারমিডিয়েট সাইন্সের পরীক্ষা শেষ হল। মারইয়ামও টেনেটুনে মেট্রিক পাস করেছে। ওর আসলে পড়াশোনার প্রতি তেমন একটা আগ্রহ ছিল না। তাই পরিবারের সবাইকে জানিয়ে দিল, 'আমি আর সামনে পড়ব না। ঘরেই থাকব।' এখন ও ঘরের কাজেই বেশি মনোযোগ দিচ্ছে।

ওদিকে আমাদের সাথে আম্মুর কথাবার্তা পুরোপুরি বন্ধ। তিনি নিজের খাবার নিয়ে রুমের ভেতরে চলে যান। তার সিনেমা ও গানবাদ্য দেখতে ভালো লাগে। সারাদিন সেগুলোতেই মজে থাকেন। আমরাও মনে করি তার থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকাই আমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর। আমরা তার সার্বিক মতি-গতি ধরতে না পারলেও দূর থেকে এতটুকু বুঝতে পারি যে, তিনি তলে তলে কিছু একটা করছেন। তার ফন্দিটা ঠিক ধরতে না পারলেও খানিকটা আবহ দূর থেকে আঁচ করতে পারতাম।

Scanned with CamScanner

ইন্টার পাস করার পর আমি বিএসসিতে ভর্তি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। ঘরের গুমোট পরিবেশ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এটাই ছিল আমার একদম শেষ উপায়। আমার এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো ধরনের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। বরং বাইরে থেকে সবাইকেই বেশ সুস্থির মনে হলো। তাদের এই অস্বাভাবিক সুস্থিরতা দেখে বুঝলাম, ভেতরে ভেতরে কোনো জটিল হিসেব-নিকেশ চলছে। এরই মধ্যে একদিন মায়ের অসাবধানতার কারণে বেশ কিছু আগাম তথ্য পেয়ে গেলাম। মারইয়াম তখন দুপুরের খাবার খাচ্ছিল। হঠাৎ সে শুনতে পেল, মেজো দিদি বলছে, 'মা, আমি আমার ভারতীয় দেবরের সাথে কথা বলেছি। মনিকার ছবি ওর ভালো লেগেছে। আশা করছি, ওকেও মনিকার ভালো লাগবে। এটা অনেক ভালো সম্বন্ধ। আমি বাবাকে সব কথা জানিয়েছি। বাবা কাল-পরশু আসবেন। শীতল ভাইয়াও সায় দিয়েছেন। বলেছেন চটজলদি বিয়ের কাজ সম্পন্ন করে ফেলতে।'

মা-ও সায় দিলেন, 'তুই ঠিকই বলেছিস। ভগবান যেন এই বিয়ে দ্রুত সম্পন্ন করেন। মনিকার বিয়ের কাজ ঠিকঠাকমতো হয়ে গেলে আমরাও ইন্ডিয়ায় চলে যাব। নীলমের জন্যও ওখানে কোনো সম্বন্ধ খুঁজে বের করতে পারলে জীবনটা বাঁচবে। তবে ওদের এখনই কোনো কথা জানানো যাবে না। অনেক কাজ বাকি। ওদের পাসপোর্টটাই তো এখন পর্যন্ত করা হলো না। ঠিক আছে, পরে কথা হবে।'

এতটুকু শুনে নীরবে রুমে ফিরে এলো মারইয়াম। ওর মুখে কোনো কথা নেই। কিছুক্ষণ চুপ থেকে নিজেকে সামলে নিল ও। ঘরের কাজে মন দিল চুপচাপ। কেউ বুঝল না যে, মারইয়াম সব শুনে ফেলেছে।

আমি বিএসসিতে ভর্তি হওয়ার জন্য কলেজে ছিলাম। বাসায় ফেরার পর মারইয়াম আমাকে রুমের ভেতরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। এরপর এত জোরে আমাকে জড়িয়ে ধরল যে, টাল সামলাতে না পেরে টেবিলের এককোণে আঘাত পেলাম। ঘটনার বিবরণ শোনার পর শারীরিক কষ্টের কথা বেমালুম ভুলে গেলাম। তার চেয়ে বড় ব্যথা হৃদয়ে তখন তোলপাড় তুলেছে। ইয়া মালিক, কী হচ্ছে এসব! এখন আমাদের কী হবে? এই নতুন আপদের কবল থেকে কীভাবে উদ্ধার পাব?

মারইয়াম আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'আয়িশা, এখন আমাদের কী হবে? আমার তো ভীষণ ভয় হচ্ছে। জানি না, এরা আমাদের কোথায় বন্দি করার ফন্দি আঁটছে!'

Scanned with CamScanner

আমি অভয় দিয়ে বললাম, 'আল্লাহর ওপর ভরসা রাখ। দেখবি, তিনিই আমাদের হিফাযত করবেন। তিনি কখনোই আমাদের নিঃসঙ্গা ফেলে রাখবেন না। নিরাশ হলে চলবে না, বোন।'

একদিকে আমি মারইয়ামকে সান্ত্বনা দিচ্ছি; অন্যদিকে ভেতরে ভেতরে আমি নিজেই ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছি। এরপরও নিজেকে সামলে নিয়ে ওকে বললাম, 'চল, আমরা এই আসন্ন বিপদ থেকে মুক্তি পেতে সালাত পড়ি। মহান আল্লাহকে ডেকে আমাদের বিপদের কথা বলি। এ কথা বলে আমি ওযু করে সালাতে দাঁড়িয়ে গেলাম। সালাত শেষে দুআর জন্য হাত তুললাম। কিন্তু মুখে একটা শব্দও আসছিল না। মনে হচ্ছিল, যাঁর কাছে দুআ করছি, তিনি তো সবকিছু জানেন। আমি আর কীই-বা চাইব। চোখে অশ্রুর ঢল নামল। আমার রব সব দেখছেন।

রাতে আমিনার সাথে যোগাযোগ করলাম। তাকে সবকিছু খুলে বললাম। আমার কথাগুলো শুনে আমিনা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। এরপর বলল, 'আমি শাইখের সাথে পরামর্শ করব। দেখি, তিনি কী বলেন।'

'আহ! এ ভাবনা আমার মনে কেন এলো না?'

আমি সাথে সাথে শাইখকে কল দিলাম। রিং বাজতেই তিনি ফোন ধরে বললেন, 'আস সালামু আলাইকুম। বোন আয়িশা, বলুন।'

আমি সালামের উত্তর দিয়ে আমাদের পেরেশানির কথা তুলে ধরলাম। সবকিছু শুনে তিনি বললেন, 'বোন, আমি আপনাকে বলেছিলাম, এই দ্বীনের জন্য অনেক কুরবানি দিতে হয়। আচ্ছা, আপনি এখন এক কাজ করুন। আপনার পরিচয়পত্র, জন্মসনদ এবং স্কুল সার্টিফিকেট-সহ যাবতীয় কাগজপত্র নিজের হিফাযতে রাখুন।'

'আমি কি এখনই এগুলো আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবো?'

'আপনি যেটা ভালো মনে করেন। কিন্তু অবশ্যই নিজের হিফাযতে রাখুন। মা-বাবার কাছ থেকে দূরে রাখুন।'

পরদিন থেকে আমি আমার ও মারইয়ামের সকল কাগজপত্র সামলে রাখতে শুরু করলাম। আলমারি থেকে সরিয়ে নিজের পার্সে নিলাম। কে জানে কখন আবার মা আলমারি থেকে নিয়ে নেন সব!

Scanned with CamScanner

দুই একদিনের মধ্যেই বাবার আসার কথা ছিল; কিন্তু কাজের ঝামেলায় আসতে পারেননি। আমি আরও পনেরো দিন অবকাশ পেয়ে গেলাম। নির্বিঘ্নে সবগুলো কাগজ একত্র করে পুটলি বাঁধলাম। এরপর আমিনার সাথে যোগাযোগ করে নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দিলাম। ও খুব সহজেই কাগজগুলো শাইখের কাছে পৌঁছে দিল। রাতে তিনি আমাকে ফোন দিয়ে কাগজপত্র পাওয়ার কথা জানালেন। ভেতর থেকে একটা ভারী নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। আল-হামদু লিল্লাহ।

বাবা বাসায় এলেন দশ দিন পর। বেশ আনন্দিত দেখাচ্ছে তাকে। আমরা হাসিমুখে বাবার সাথে দেখা করলাম। সারাদিন বাবার কাছে কাছে থাকলাম। চেষ্টা করলাম তাকে যথাসম্ভব ভাবনামুক্ত রাখার। কারণ আমরা এমনিতেই জানতাম, আমাদের জন্য সামনে খুব জটিল সময় অপেক্ষা করছে। কিন্তু আমাদের অবাক করে দিয়ে বাবা সেদিন কোনো পাকা কথা বললেন না। বরং বললেন, 'আমি নিজেই ছেলের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেব। ইন্ডিয়ায় আমার কিছু পরিচিত লোক আছেন। তারা ছেলেটিকে চেনেন।'

বাবার কথা শুনে দুই ভাই বিমর্ষ হয়ে গেলেন। দিদিরাও ঘ্যানঘ্যান শুরু করেছে। আম্মুর তো রীতিমতো মুড অফ! তাদের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, কেউ তাদের পাকা ধানে মই দিয়েছে। আম্মু ঠোঁট উল্টিয়ে বললেন, 'তুমি জেনে-বুঝে এই পথ বন্ধ করছ, যাতে আগামীতে আমাদের মুখে চুনকালি পড়ে। দেখো, এই মেয়ে একদিন কারও সাথে পালিয়ে যাবে।'

বাবা থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি এখান থেকে যাও তো। আর লক্ষ্মী, তুমিও এখন তোমার শ্বশুরবাড়ি চলে যাও। আমি নিজেই ছেলের খোঁজখবর নেব। মনিকা, তুই আমার জন্য এক গ্লাস জল নিয়ে আয়।'

আমি বাবার জন্য পানি নিয়ে এলাম। কিন্তু বাবার হাতে তুলে দেওয়ার আগেই গ্লাসটি হাত ফসকে আমার পায়ের ওপর পড়ল। সাথে সাথে ব্যথায় ককিয়ে উঠলাম। পরক্ষণেই মনে হলো, আমার কারণে বাবাকে এর চেয়েও অনেক বেশি কষ্ট পোহাতে হচ্ছে!

বিচ্ছেদের ভাবনা

বাবা সপ্তাহখানেক বাসায় থেকে নভেম্বরে 'টান্ডুওয়ালা ইয়ার' চলে গেলেন। সেখানেই তার কর্মস্থল। নভেম্বরের বাকি দিনগুলোও নির্বিঘ্নে কেটে গেল। জানি

Scanned with CamScanner

না, ঘরের লোকদের ভাবনায় কী চলছে; তবে আমরা দু-বোন নিজেদের ভাবনা নিয়েই ব্যস্ত আছি। কীভাবে ঘর ছাড়ব, কোথায় যাব তা নিয়েই ভাবছি। সাধ্যের মধ্যে টুকটাক প্রস্তুতিও সেরে নিচ্ছি।

মাঝে মাঝে ঘরের লোকদের কথা ভেবে চোখে পানি চলে আসে। মনের গতিপথ বদলে যায় তখন। অবুঝের মতো আল্লাহর কাছে দুআ করি, 'হে আল্লাহ, কখনো যেন বাধ্য হয়ে আমাদের এই ঘর ত্যাগ করতে না হয়।'

আমরা কোথায় যাব? কী করব? বাবাকে রেখে কীভাবে থাকব? বাবা ছাড়া আমাদের জীবন কেমন হবে? কে এসে বাবার কাপড় ধুয়ে দেবে? কে আয়রন করে রাখবে? ছিঁড়ে গেলে কে সেলাই করে দেবে? ছোট ভাই দীপককে স্কুলের জন্য কে রেডি করবে? তার খাবার রান্না করবে কে? আল্লাহ না করুন, আমরা যদি ধরা পড়ি, তখন কী হবে? উফ, আর কিছু ভাবতে পারছি না আমি! কখনো আবার আল্লাহর মহব্বত এতটাই প্রবল হয়ে ওঠে যে, রক্তের বাঁধন তখন নেহাতই তুচ্ছ মনে হয়।

ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি। আমার এক আত্মীয়ের বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হয়েছে। ঘরের লোকজন ও আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে উৎসব শুরু হয়ে গেছে বিয়েকে কেন্দ্র করে। বাবা, ভাইয়া ও পরিবারের অন্য লোকেরা বিয়ে নিয়ে এতটাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, তাদের অন্য কোনো দিকে তাকানোর ফুরসতও নেই। শুধু আমি আর মারইয়াম নিজেদের এই আয়োজন ও ব্যস্ততা থেকে গুটিয়ে রেখেছি। একদিন মারইয়াম আমাকে হেসে বলছে, 'দিদি, চলো এই ফাঁকে আমরা বেরিয়ে পড়ি!'

দিনগুলো কাটছে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মাঝে। শাইখ নিয়মিত মোবাইলে আমাদের খোঁজখবর নেন। তাকে আমি সবসময় অনুরোধ করি, 'দুআ করুন, আল্লাহ যেন আমাদের জন্য দ্রুত কোনো পথ বের করে দেন। আমাদের সাহসে কুলোচ্ছে না।'

আজকাল হৃদয় উজাড় করে বাবার জন্য দুআ করি, 'হে আল্লাহ, আপনি তাকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করুন।' এর মধ্যে একদিন বাবাকে নিয়ে চমৎকার এক স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নে আমি মাগরিবের সালাতের জন্য ওযু করছি। আর বাবা মাথায় টুপি পরে মসজিদে যাচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ! ইয়া আল্লাহ, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী! কবে আমার এই স্বপ্ন পূরণ হবে? তবে আমি প্রচণ্ড আশাবাদী যে, মহান আল্লাহ অবশ্যই তাকে কোনো একদিন হিদায়াতের আলোয় নিয়ে আসবেন।

Scanned with CamScanner

এভাবেই পার হয়ে গেল বেশ কয়েকদিন। এখন ভারতীয় সেই সম্বন্ধ নিয়ে ঘরের লোকজনদের দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়ে গেছে। ভাই-বোনদের মাঝে ব্যাপক কানাঘুষা চলছে। বাবার ঘরে ফেরার অপেক্ষা করছেন তারা সবাই। বাবা ঘরে ফিরতেই ভাইয়ারা নানাভাবে বাবার ওপর চাপ প্রয়োগ করতে শুরু করলেন। তাদের চাপের মুখে বাবা বাধ্য হলেন আত্মসমর্পণ করতে। ঘরের সবাই বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার দিনক্ষণ আর স্থান নির্বাচনের জন্য বৈঠকে বসলেন।

মা বললেন, 'এ অঞ্চলে আমাদের যে পরিমাণ দুর্নাম ছড়িয়ে গেছে, তাতে সমাজের একজনও এই বিয়েতে অংশগ্রহণ করবে না। এমনকি আমার বাবার বাড়ির লোকজনও আসবে না। চলো আমরা ইন্ডিয়া চলে যাই। সব আয়োজন সেখানেই হোক।' বড় ভাই ও মেজো ভাই একসঙ্গে এই প্রস্তাবে সায় দিলেন।

এই বৈঠকের পর বাবা আবার ফিরে গেলেন কর্মস্থলে। এরপর ছুটি নিয়ে ফিরলেন পনেরো দিনের জন্য। সবার সাথে পরামর্শ করে একদিন বাবা আমার রুমে এলেন। বললেন, 'মনিকা, আমরা ইন্ডিয়া বেড়াতে যাব। অনেক দিন হলো ইন্ডিয়া যাই না। সেখান থেকে ঘুরে এলে সবার ভালো লাগবে। এখন পর্যন্ত তোর আর নীলমের পাসপোর্ট করা হয়নি। তোদের আইডি কার্ড দিস। আর কাল আমার সাথে পাসপোর্ট অফিসে যাবি। সকাল এগারোটায় আমরা যাব। আগ থেকেই রেডি থাকিস।'

মারইয়াম বই পড়ছিল। বাবার কথা শুনে হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে আবার বসে পড়ল। এ ধরনের পরিস্থিতির জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না আমরা। তবে দ্রুতই নিজেকে সামলে নিলাম। বললাম, 'বাবা আইডি কার্ড তো আমার কাছে নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে বাবা চমকে গিয়ে বললেন, 'কোথায়? কার কাছে দিয়েছিস?'

'কলেজে ভর্তি ফরম জমা দেওয়ার সময় ম্যাডামের কাছে দিয়েছিলাম। আজ আনব, কাল আনব, করে আর আনা হয়নি। কাল নিয়ে আসব। আপনি চিন্তা করবেন না।'

'পাগলি কোথাকার! আমাকে তো চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলি। আইডি কার্ড কি কেউ অন্যের কাছে রাখে! কাল অবশ্যই নিয়ে আসবি'।

'জি, অবশ্যই নিয়ে আসব। তুমি চিন্তা কোরো না।'

Scanned with CamScanner

আমাকে চিন্তার সাগরে ফেলে বাবা তার কামরায় চলে গেলেন। সারা রাত বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদলাম। কখনো মারইয়াম আমাকে সান্ত্বনা দিল; আবার কখনো আমি মারইয়ামের অশ্রু মুছে দিলাম। অবশেষে শাইখ হাফিজুর রহমানকে কল দিলাম। তিনি কল রিসিভ করলেন, 'আস সালামু আলাইকুম। বোন আয়িশা, কী অবস্থা?'

অনবরত হেঁচকির কারণে আমার মুখ থেকে শব্দ বেরুচ্ছিল না। তিনি আমাকে অভয় দিয়ে বললেন, 'মন ছোট করবেন না। আল্লাহ অবশ্যই সাহায্য করবেন। সাহস ধরে রাখুন। আপনাদের নৌকা তীরে ভিড়তে শুরু করেছে। কেন ঝড়ের ভয় পাচ্ছেন? সাহস ধরে রাখুন। আমি আপনাদের ভাই। আল্লাহ অবশ্যই আপনাদের সাহায্য করবেন।'

আমি শাইখের কাছে পুরো অবস্থা তুলে ধরলাম। তিনি বললেন, 'সত্যের এই পথে আমি আমার জীবন হাতের মুঠোয় নিয়ে হলেও আপনাদের নিরাপত্তা দেবো, ইন শা আল্লাহ। মহান রাব্বুল আলামিনের ওপর আপনি পূর্ণ আস্থা রাখুন।'

শাইখ যখনই আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলেন, সাথে সাথে আমার অন্তর থেকে দুশ্চিন্তার বোঝা নেমে গেল। একরাশ স্নিগ্ধ বাতাস যেন ছড়িয়ে পড়ল বুকের গহীনে।

ঘটনার ঘনঘটা

রোববার। বাবা জানতেন, আজ কলেজ বন্ধ। তাই আইডি কার্ড আনার ব্যাপারে আর কিছু বললেন না। আমরা দু-বোন অনেক দেরিতে ঘুম থেকে উঠলাম। খুবই বিধ্বস্ত শরীরে রান্নাঘরে গেলাম। চা বানালাম। খাবারের গ্রাস তো দূরের কথা, চা-টাও যেন গলা বেয়ে নামতে চাইছে না। অনেক কষ্টে দু-লোকমা খাবার গলা দিয়ে পার করালাম। রান্নাঘর থেকে বেরুনোর সময় মনে হলো, পৃথিবীটা আমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে এসেছে। নিজের অজান্তেই চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। কিছুতেই সংবরণ করতে পারলাম না। বাবা আর ভাইদের ময়লা কাপড়গুলো বের করে ভালো করে ধুয়ে দিলাম। তাদের জন্য খাবার তৈরি করলাম। এরপর কাপড়গুলো আয়রন করে সাজিয়ে রাখলাম আলমারিতে।

অদ্ভুত সব চিন্তা মাথায় খেলা করছে। আমরা যখন এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব, তখন তো অবশ্যই আমাদের খোঁজে বাবা-ভাইয়ারা রাস্তায় বেরুবেন। তখন যেন তাদের আয়রন ছাড়া কুঁচকানো জামা-প্যান্ট পরতে না হয়। পরনের পোশাক নিয়ে যেন

Scanned with CamScanner

ঝামেলার সম্মুখীন হতে না হয়।

আহ! ভাবলেই বুকের মাঝে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। জীবনটা কেন এমন হয়ে গেল! কেন আমরা সবাই মিলে জান্নাতের পথে এগিয়ে যেতে পারছি না? কেন সবাইকে ছেড়ে আমাদের দুজনকেই চলে যেতে হচ্ছে? ইশ, যদি ইসলামের ছায়াতলে সপরিবারে ঠাঁই হতো!

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ছুটির দিনটা কেটে গেল। আজ সোমবার। বাবা কোনো কাজে বাইরে গিয়েছেন। আমিও আর কলেজে গেলাম না। ঘরের অন্যান্য কাজকর্ম করতে লাগলাম। মেজো ভাই গুড্ডু তার টাকা-পয়সা আমার কাছে রাখেন। ড্রয়ার খুলে তার হিসাব-নিকাশ করলাম। এরপর একটি চিঠি লিখলাম। সেই চিঠিতে টাকা-পয়সার বান্ডিলও রাখলাম হিসাব-সহ।

নিজের জন্য অতিরিক্ত দু-তিনটা সিমকার্ড জোগাড় করেছি। কে জানে, কখন কোথায় কোন প্রয়োজনে কাজে লাগে। বাবা আমাদের মাঝে মাঝে হাতখরচের জন্য কিছু টাকা দেন। সেগুলো পার্সে রাখা আছে। আমার জিনিস বলতে স্রেফ এগুলোই। এর সাথে একটি কায়দা, আমিনার দেওয়া ছোট্ট একটা তাসবিহ, আমার ও মারইয়ামের দুই জোড়া পোশাক, আর বাবা-মার একটি করে ছবি। ব্যস, এগুলোই আমাদের সম্বল। আর আমাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তো আগেই শাইখের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাবা ফিরে এলেন। আমার রুমে এসে আইডি কার্ডের কথা তুললেন আবার। আমি বললাম, 'বাবা, আজ শরীরটা ভালো লাগছিল না। এ জন্য কলেজে যাইনি। কাল যাব।'

বাবা তখন বললেন, 'আমার ছুটি ফুরিয়ে আসছে। এই ছুটিতেই তোদের পাসপোর্টগুলো রেডি করতে চাচ্ছিলাম। আমরা ফেব্রুয়ারিতে ইন্ডিয়া যাব। কাল আমি কলেজে যাব তোর সাথে। সেখান থেকে কার্ড নিয়ে সোজা পাসপোর্ট অফিসে। তুই আর নীলম তৈরি থাকিস।'

নীলমের অবশ্য আইডি কার্ড নেই। তবে আইডি কার্ডের মেমো ছিল।

পরদিন বাবা আমার সাথে কলেজে গেলেন। আমাদের ভেতরে পাঠিয়ে গেইটের কাছে অপেক্ষা করতে লাগলেন। বললেন, 'দ্রুত নিয়ে আয়। আমি অপেক্ষা করছি।'

Scanned with CamScanner

আমি দ্রুত পায়ে কলেজের ভেতরে প্রবেশ করলাম। ক্লাসরুমের দিকে না গিয়ে বারান্দায় চলে গেলাম সোজা। কয়েকজন মেয়ে তখন বারান্দায় গল্প করছিল। আমি তাদের 'কাল আসব' জানিয়ে গেইটে ফিরে এলাম। বাবা তখনো দাঁড়িয়ে আছেন। আমার বুকের ভেতরে ধকধক করছে।

'বাবা, ম্যাডাম আজ ছুটিতে আছেন। তার কাছে ড্রয়ারের চাবি। তিনি কাল আসবেন।'

আমার কথা শুনে বাবা বিরক্ত হলেন। বললেন, 'উফ! তোদের এই উল্টাপাল্টা কাজগুলো আমাকে পেরেশান করে ফেলছে। কোথায় আইডি কার্ড নিজের কাছে যত্ন করে রাখবি, তা না করে কলেজে রেখে এসেছিস!'

বাবার সাথে বাসায় ফিরে এলাম। মারইয়াম তখন উদ্বিগ্ন চোখে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

গৃহত্যাগ

রাতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমিনা আর আনআমের সাথে ফোনে কথা হলো। এতক্ষণে আমাদের মন শক্ত হয়ে গেছে। চোখের অশ্রু শুকিয়ে গেছে। শাইখ হাফিজুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করে কর্মপরিকল্পনা জানালাম। তিনি আমাকে সাহস দিলেন। বললেন, 'সঙ্গে খুব বেশি জিনিস বা পোশাক-আশাক নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাহলে যাত্রাপথে কষ্ট পোহাতে হবে।' আমরা তেমনটাই করলাম।

দু-বোন সবার আগে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করলাম। কেঁদেকেটে দুআ করলাম মহান রবের কাছে। কিছুক্ষণ পর মসজিদের মিনার থেকে ফজরের আযান ভেসে এলো। মসজিদের মিনার বরাবরই আমার প্রিয় জিনিস। আমার পুরোনো সাথি। মিনারটা যেন আমাদের পথ দেখানোর জন্য আলো হাতে দাঁড়িয়ে আছে। এরপর ফজর সালাত আদায় করলাম। নির্ধারিত তাসবিহ পড়লাম। যিকির করলাম, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' যিকিরে মনটা আরও শক্ত হলো। আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন।

সকাল আটটা। বাবা ও বড় ভাইয়া কোনো কাজে বাইরে চলে গেছেন। ছোট ভাই দীপককে স্কুলের জন্য তৈরি করলাম। কিছুক্ষণ পর দীপকও বেরিয়ে গেল। সাড়ে নয়টার দিকে আমরা হালকা কিছু নাশতা করলাম। আজ আমরাই আম্মুর নাশতা রেডি করে তার রুমে গেলাম। কিন্তু তিনি আমাদের নাশতা ফিরিয়ে দিলেন।

Scanned with CamScanner

বললেন, 'আমি নাশতা করেছি। এখন আমি শুয়ে পড়ব। কেউ যেন আমাকে ডিস্টার্ব না করে।'

দশটার দিকে দু-রাকাত নফল সালাত আদায় করলাম। এরপর মহান আল্লাহর দরবারে হাত তুলে বললাম, 'হে আল্লাহ, হে দুই জাহানের পালনকর্তা, আমরা আপনার দয়ার ভিখারি। আপনার রহমতের দুয়ারে উপস্থিত। লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক।'

দুআ শেষ করে শরীরে ওড়না জড়িয়ে নিলাম। পার্স হাতে নিয়ে আক্ষেপভরা চোখে আম্মুর রুমের দিকে একবার তাকালাম। এরপর বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। আমাদের পাশ দিয়ে একটি রিকশা যাচ্ছিল। তাকে ডেকে বললাম, 'মদিনা মসজিদে যাব।'

রিকশায় চড়ে পেছন ফিরে বাড়ির দিকে বারবার তাকাচ্ছিলাম। বেদনাবিধুর চক্ষু বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে অবিরাম। যত দেখি, ততই তৃষ্ণা বাড়ে। মোবাইলে শাইখ হাফিজুর রহমানকে কল দিয়ে জানালাম, 'আমরা রিকশায় উঠেছি।' এর আগে আমরা কখনো শাইখকে দেখিনি। তিনিও আমাদের দেখেননি। মদিনা মসজিদের গেইটে এসে রিকশা থেমে গেল। দেখলাম, সেখানে নূরানি চেহারার একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। গায়ে সফেদ জামা। আপাদমস্তক শরিয়তসম্মত পোশাকে সুসজ্জিত। তিনি রিকশাওয়ালার কাছে এসে মুষ্ঠিবন্ধ হাতের ভেতর থেকে টাকা বের করে ভাড়া শোধ করলেন। এরপর আমাদের বললেন তাকে অনুসরণ করতে।

আমি মন থেকে সায় পেলাম—হ্যাঁ, চোখ বন্ধ করেই তাকে অনুসরণ করা যায়। কখনো মনের ভেতরে এ প্রশ্ন ওঠেনি যে, কে আপনি? আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

আমরা তার পেছন পেছন মসজিদ-চত্বরের বিপরীত দিকে একটা দরজা অতিক্রম করলাম। এরপর উঠতে লাগলাম সিঁড়ি বেয়ে। পথ দেখাতে তিনি আমাদের আগে আগে যাচ্ছেন। একটি রুম খুলে আমাদের ভেতরে যেতে বললেন। আমরা রুমের ভেতরে প্রবেশ করলাম। এবার দরজার বাইরে থেকে আমাদের বলতে লাগলেন, 'আমি হাফিজুর রহমান। এই মসজিদের ইমাম ও মাদরাসার পরিচালক। আমার অনুমান ঠিক হলে আপনাদের একজন আয়িশা এবং অপরজন মারইয়াম।'

Scanned with CamScanner

আমি বললাম, 'হাফিজ ভাই। আপনার অনুমান সঠিক। আমাদেরও মনে হচ্ছে, আমরা সঠিক লোকের কাছেই এসেছি।'

'আপনারা এখন মাদরাসার একটি কক্ষে অবস্থান করছেন। এখানে আপনারা পুরোপুরি নিরাপদ, ইন শা আল্লাহ। কোনো চিন্তা করবেন না। কিছুক্ষণ পর আপনাদের আমার সাথে আদালতে যেতে হবে। সেখানে নিজেদের মুসলিম হওয়ার স্বীকারোক্তি দিতে হবে।'

'জি, আমরা প্রস্তুত।'

একটু পর আট-নয় বছরের একটা ছেলে আমাদের জন্য নাশতা ও চা নিয়ে এলো। আমরা একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম রুমের চারপাশে। দেখলাম, একপাশের দেয়ালে নিকাবসহ দুটি বোরকা ঝোলানো আছে। সাথে দুই সেট হাত-মোজা আর পা-মোজা। আমাদের বুঝতে বাকি রইল না, এই বোরকা দুটো আমাদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে। এই অভাবিত নিআমত দেখে মন থেকে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম।

কিছুক্ষণ পর ওই ছেলেটি আমাদের নিচে যেতে বলল। আমাদের ডেকে দরজার বাইরে চলে গেল সে। আমরা বোরকা পরে নিলাম। হাত-মোজা, পা-মোজাও পরলাম। এরপর ছেলেটির দেখানো পথ ধরে নেমে এলাম নিচে। মাদরাসার অন্য গেইটে একটি গাড়ি দাঁড়ানো। শাইখ হাফিজুর রহমান সাহেব গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ছেলেটি আমাদের সেখানে পৌঁছে দিল। গাড়ির দরজা আগে থেকেই খোলা ছিল। বিসমিল্লাহ বলে গাড়িতে বসে পড়লাম।

ম্যাজিস্ট্রেটের মুখোমুখি

শাইখ হাফিজ সাহেব কাপজপত্র তৈরি করার জন্য এক ব্যক্তিকে আগেই আদালতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। গাড়িতে বসে তার সাথে যোগাযোগ করছেন এখন। এ জন্য আমাদের কোনো ধরনের ঝামেলার মুখোমুখি হতে হয়নি। আমরা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের মুখোমুখি হলাম। প্রথমে তিনি আমাদের নাম ও বয়স জিজ্ঞেস করলেন। আমার পরিচয়পত্র দেখলেন। এরপর মারইয়ামের পরিচয়পত্র চাইলেন। আমি বললাম, 'ওর পরিচয়পত্র এখনো তৈরি হয়নি; তবে জন্মসনদ আছে। সেখানে ওর বয়সের সত্যায়নও রয়েছে। জন্মসনদ অনুসারে ও এখন আঠারো-ঊনিশের মাঝামাঝি।'

Scanned with CamScanner

জজ সাহেব বললেন, 'আমি মিরপুরখাসের সিভিল জজ। আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করব।'

'জি, করুন। আমি সঠিক উত্তরটিই দেওয়ার চেষ্টা করব।'

'আপনি কখন মুসলিম হয়েছেন?'

'আমাদের ইসলামগ্রহণের পর তিন বছর পেরিয়ে গেছে। এখন চতুর্থ বছর শুরু হয়েছে।'

'আপনারা কি স্বেচ্ছায় মুসলিম হয়েছেন?'

'জি, অবশ্যই। আমরা নিজেদের ইচ্ছায় মুসলিম হয়েছি। আল্লাহ আমাদের ইসলামের ওপর অবিচল রাখুন।'

আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর জজ সাহেব মারইয়ামের মুখোমুখি হলেন। বললেন, 'এবার আপনার বিষয়টি বলুন।'

'আমার নাম মারইয়াম। আমিও স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমাদের ওপর কারও কোনো চাপ নেই।'

আমি তখন বললাম, 'জজ সাহেব, আইনের দৃষ্টিতে আমরা প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ। কাজেই আমাদের মর্জিমতো জীবনযাপন করার অনুমতি দেওয়া হোক। আমরা ইসলামি শিক্ষা গ্রহণের জন্য মাদরাসায় থাকার অনুমতি চাই। আমরা যেন কোনো মহিলা মাদরাসায় গিয়ে ইসলামি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি—আমাদের সে অনুমতি দিন।'

জজ সাহেব আরও কিছু প্রশ্ন করলেন। আমরা প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দিলাম। তখন জজ সাহেব আমাদের সত্যায়িত সার্টিফিকেট দিলেন।

করাচির সীমানায়

আদালতে স্বীকারোক্তি দেওয়ার পর আমরা মাদরাসায় ফিরে এলাম। আমাদের রুমে এটাচড বাথরুম ছিল। সেখানে হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হলাম। রুমে ফিরে এক গ্লাস পানি পান করলাম। শাইখ আমাদের জন্য চা পাঠালেন। মোবাইলে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের কোনো কিছু লাগবে কি না। মাগরিবের সালাতের পর তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন তার বাড়িতে। সেখানে তার বয়স্ক মা ও স্ত্রী আমাদের

Scanned with CamScanner

সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। আমাদের পেয়ে তারা অত্যন্ত খুশি হলেন। ভাবির কোলে দুই বছরের একটি শিশু ছিল। বাসায় গিয়ে আমরা তাকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। খুব দ্রুত ওর সাথে আমাদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠল।

ইশার সালাতের পর শাইখ যখন ঘরে এলেন তখন ভাবির মাধ্যমে আমাদের জানিয়ে দিলেন, 'এবার যেন আমরা ঘরের লোকদের সাথে যোগাযোগ করি। তারা নিশ্চয়ই চরম উৎকণ্ঠায় আছেন। তাদের যেন আমরা জানিয়ে দিই যে, মিরপুরখাস থেকে বেশ দূরে 'হুব্ব চৌকি'র দিকে এক জায়গায় আমরা নিরাপদে আছি। এই মুহূর্তে একটি ইসলামি প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করছি আমরা। আমাদের নিয়ে তারা যেন কোনো ধরনের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাবোধ না করে। অযথা খোঁজাখুঁজির কষ্ট না করে।'

শাইখের পরামর্শ শুনে আমরা বিস্মিত হলাম। ইয়া আল্লাহ, আমাদের পিতা-মাতার জন্যও এই মানুষটির কত চিন্তা! মা-বাবার দুটি যুবতী মেয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলে তাদের মনেও যে উদ্বেগ সৃষ্টি হতে পারে, বিষয়টি তার সচেতন ও সহানুভূতিশীল অন্তর ভুলে যায়নি। আমাদের মন থেকে শাইখের জন্য নিখাদ দুআ বেরিয়ে এলো।

আমি তখন আমার মোবাইলে নতুন একটি সিম সংযুক্ত করে বাসায় ফোন করলাম। বাবা ফোন রিসিভ করলেন। আমি সালাম দিয়ে বললাম, 'বাবা, আস সালামু আলাইকুম। আমি মনিকা বলছি।'

'মা আমার, কোথায় তুই? নীলমই-বা কোথায়?'

'বাবা, আমরা দুজনই ইসলাম গ্রহণ করেছি। আজ আমরা কোর্টে হলফনামা দিয়েছি। এখন মিরপুরখাস থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। হুব্ব চৌকি এলাকায় একটি ইসলামি প্রতিষ্ঠানে বেশ নিরাপদে আছি। আপনি আমাদের নিয়ে কোনো চিন্তা করবেন না। অযথা আমাদের খোঁজও করবেন না। ঘরের সবাইকে আমাদের সালাম জানাবেন। আমি আপনাদের সবাইকে ইসলামগ্রহণের দাওয়াত দিচ্ছি। বাবা, আপনি জলদি ইসলাম গ্রহণ করুন। ইন শা আল্লাহ, আমাদের ঘরের প্রতিটি সদস্য ইসলামের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠবে।'

একাধারে অনেকগুলো কথা বলে আমি থেমে গেলাম। রিসিভারের ওপাশেও কোনো সাড়া-শব্দ নেই। দু-পাশেই পিনপতন নীরবতা। কিছুক্ষণ পর ওপাশ থেকে বাবার বিধ্বস্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, 'মনিকা, তুই এটা কী করলি?'

Scanned with CamScanner

এরপরই লাইন কেটে গেল।

আমি মারইয়ামকে জড়িয়ে ধরে হেঁচকি তুলে কাঁদতে শুরু করলাম। মারইয়ামও কাঁদতে লাগল। ভাবি এগিয়ে এসে আমাদের সান্ত্বনা দিলেন। আমাদের খাবার খাইয়ে দিলেন। শাইখের মা তখন প্রচণ্ড অসুস্থ। বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারেন না।.ভাবি তার কাছে নিয়ে গেলেন আমাদের। তিনিও ক্ষীণ কণ্ঠে আমাদের সান্ত্বনা দিলেন।

দ্বিতীয় দিনটিও এখানেই কেটে গেল। ওদিকে মাওলানা সাহেব প্রচণ্ড ব্যস্ত। করাচিতে কার সাথে যেন যোগাযোগ করেই যাচ্ছেন। একদিকে মায়ের অসুস্থতা নিয়ে উদ্বিগ্ন সময় কাটাতে হচ্ছে। অন্যদিকে তার আপন ছোট ভাই সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। এখন তাকে সামাল দিতে হচ্ছে দু-দিকেই।

রাতে ইশার সালাত আদায় করে আমরা বসে আছি। এখনো জায়নামায থেকে উঠিনি। শাইখ লোকমারফত সংবাদ পাঠালেন, তার আম্মাজানের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তিনি আমাদের কাছে দুআ চাইছেন। সংবাদ শুনে আমরা জায়নামাযে বসেই দুআ-দরুদ ও তাসবিহ-তাহলিল পড়তে লাগলাম। আল্লাহর কাছে দুআ করতে লাগলাম। দুই রাকাত সালাত আদায় করলাম। শাইখের মায়ের সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করলাম আকুল হয়ে। এভাবেই রাত দুটো বেজে গেল। নফল সালাতে দাঁড়ালাম আবার। সালাতের শেষ রাকাতে এসে নিজেকে সংবরণ করতে পারলাম না। বুকের ভেতর থেকে হেঁচকি তোলা কান্না বেরুতে লাগল। বারবার আল্লাহকে ডেকে বলতে লাগলাম, ইয়া রাব্বুল আলামিন, আপনি শাইখের মাকে সুস্থ করে দিন। এর পাশাপাশি আমাদের বাবা-মাকেও হিদায়াত দান করুন। ইয়া আল্লাহ, শাইখ ভীষণ সমস্যায় আছেন। আপনি তার পেরেশানি দূর করুন। হে পরওয়ারদিগার, এই পাপীর দুআ কবুল করুন। ইয়া আল্লাহ, আমাকে আর মারইয়ামকে দ্বীনের ওপর অবিচল রাখুন। আমিন।'

যখন মসজিদ থেকে ফজরের আযান ভেসে আসছিল, তখন আমি জায়নামাযে পড়ে ছিলাম। সকাল দশটায় শাইখ ঘরে এলেন। নাশতা সারলেন। এরপর আমাদের ফোন করে জানালেন তার মা সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

ফজর সালাতের পর দেখতে পেলাম, শাইখের মা উঠোনে পায়চারি করছেন। সেখানে করাচির মাদরাসা নিয়েও কিছু কথাবার্তা হলো। শাইখ বললেন, 'ইন শা আল্লাহ, আমরা দ্রুতই করাচি চলে যাব। তবে তার আগে দু-তিন দিন আমার এক

Scanned with CamScanner

আত্মীয়ের বাসায় থাকতে হবে। তিনি মুফতি সাহেব। তার কাছে অবস্থান করলেই বেশি ভালো হবে। কারণ শহরে এখন থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। আপনার আত্মীয়-স্বজন নানা জায়গায় যোগাযোগ করে বেড়াচ্ছে। পুলিশ খোঁজাখুঁজি করছে। এই অবস্থায় করাচির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়াটা সমীচীন হবে না। পরিস্থিতি খানিকটা স্বাভাবিক হলে আমরা কিছু একটা করব।'

সেদিন সন্ধ্যায় শাইখ তার স্ত্রী, ছেলে ও আমাদের নিয়ে মুফতি সাহেবের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলেন। আগেই তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। চারটি গাড়ির প্রহরায় মুফতি সাহেবের বাসায় পৌঁছে দেওয়া হলো আমাদের। পুরো পথে মাদরাসার ছাত্ররা আমাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেছে। পথিমধ্যে একটি জঙ্গল পেরোতে হয়েছিল। জায়গাটা অনেক পরিচিত মনে হচ্ছিল আমার কাছে। তাই আমি নিশ্চিত হওয়ার জন্য আশেপাশে একটি ছোট্ট টিলা খোঁজ করতে লাগলাম। এরপর হঠাৎ মারইয়ামকে বললাম, 'মারইয়াম, ভুলেও পেছনে ফিরে যাওয়া যাবে না। ওই যে দূরে একটি ঘর থেকে আলো আসছে। ইন শা আল্লাহ আমরা সেখানেই যাব। এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত বরকতময় জায়গা। এটাই সেই ঘর, কয়েক মাস আগে যা আমি স্বপ্নে দেখেছি। আমি তোকে পুরো ঘরের বিবরণ বলতে পারব।'

মারইয়াম আমার দিকে বিস্মিত চোখে তাকাল। ব্যাপারটা ওর কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এই অবিশ্বাস্য ঘটনাই বাস্তব সত্য বলে প্রমাণিত হলো। ঘরে প্রবেশ করতেই দুজন ভদ্র মহিলা আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। তারা দুজনই মুফতি সাহেবের স্ত্রী। তাদের সাথে অনেকগুলো ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে ছিল। আমরা এতক্ষণ যে জায়গাটিকে জঙ্গল মনে করছিলাম, আসলে সেটা একটা ফার্ম হাউজ। মুফতি সাহেবের নিজস্ব ফার্ম হাউস। এই ফার্ম হাউজেই তাদের বাড়ি। এখানে আমরা তিন দিন তাদের আতিথেয়তা গ্রহণ করি। তারা হৃদয় উজাড় করে আমাদের যত্ন-আত্তি করেন। আমাদের দেখভাল করেন নিজের মেয়ের মতো করে।

বাড়িটি ছিল বিশাল আয়তনের। নারী-পুরুষদের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক জায়গা। আমরা পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে সব জায়গায় ঘুরতে পেরেছি। এমনকি আমরা রান্নার কাজেও সহায়তা করেছি। মুফতি সাহেব আমাদের হাতের রান্না খেয়ে অনেক তারিফ করলেন। তার প্রতিটি কথায় পিতার স্নেহ-মমতা খুঁজে পাচ্ছিলাম যেন।

Scanned with CamScanner

মুফতি সাহেবের বাড়িতে থাকা হলো তিনদিনের মতো। এ সময় বলতে গেলে পুরো ফার্ম হাউজ চষে বেড়িয়েছি। সতেজ আবহাওয়া। নিঃশ্বাস নিতেই দেহমন চাঙা হয়ে ওঠে। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় হাফিজ ভাই ফোন করে জানালেন, 'আজ শহরের পরিস্থিতি শান্ত মনে হচ্ছে। আপনাদের মিরপুরখাসে নিয়ে যেতে আসব। এরপর আপনাদের নিয়ে করাচি যাব কাল। আমি সেখানে একটি মহিলা মাদরাসার সন্ধান পেয়েছি। খুবই সুন্দর আর সাজানো গোছানো মাদরাসা। ইন শা আল্লাহ, আপনারা সেখানে নিরাপদে থাকবেন।'

মারইয়াম তো এ বাড়ির শিশুদের সাথে এমনভাবে মিশে গেছে যে, সারাক্ষণ ওদের সাথে খুনশুটিতে মেতে থাকছে। খেলাধুলা করছে সারাক্ষণ।

আমরা সন্ধ্যায় সফরের জন্য যখন পুরোপুরি প্রস্তুত তখন শাইখ ফোন করে জানালেন, আজ আপনাদের বাবা-মা আমার কাছে এসেছিলেন। তারা আপনাদের নিয়ে চরম উদ্বিগ্ন। কীভাবে যেন জানতে পেরেছেন, আমার কাছে আছেন আপনারা। তারা আমাকে বললেন, 'আমাদের মেয়ে-দুটো আপনার কাছে এসেছে। আল্লাহর ওয়াস্তে ওদের সাথে আমাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিন।'

'এখন আপনিই বলুন, কী করব?'

'আপনি আমাদের বড় ভাই। যা সংগত মনে করেন, তাই করুন। আমরা আপনার প্রতিটি সিদ্ধান্ত মাথা পেতে মেনে নেব।'

'আমার মনে হচ্ছে, আপনারা দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারেন। আপনাদের এক নজর দেখতে পেলে আপনাদের বাবা সান্ত্বনা পাবেন। আমি তাকে বলেছি, সম্ভবত আপনাদের মেয়েরা হুব্ব চৌকির মাদরাসায় আছে। আমি যোগাযোগ করে কাল বলতে পারব।'

'ঠিক আছে। তাহলে আগামীকাল সাক্ষাৎ করব।'

সন্ধ্যা ছয়টায় শাইখ চারটি গাড়ি সাথে নিয়ে উপস্থিত হলেন। পূর্বের মতো নির্দিষ্ট পয়েন্টগুলোতে নিরাপত্তা প্রহরী বসিয়ে দিয়েছিলেন। এবার তিনি আমাদের তার বাসায় নিলেন না; বরং শহরের ঠিক মাঝখানে একটি বাসায় নিয়ে গেলেন। সে বাসায় আপাতত কেউ বসবাস করে না। শাইখের স্ত্রী আগে থেকেই আমাদের জন্য

Scanned with CamScanner

সেখানে অপেক্ষা করছিলেন।

ওই বাড়ির সীমানায় পৌঁছেই চিনতে পারলাম জায়গাটা। এর লাগোয়া বিল্ডিংয়ে আমার মামারা বাস করেন। মাঝখানে স্রেফ একটি মাত্র দেয়ালের ব্যবধান। ওই ঘরে যতক্ষণ ছিলাম, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল।

খুব ভোরে মাদরাসায় চলে এলাম আমরা। সকাল দশটায় শাইখ বাবাকে কল করে জানালেন, 'আমি হুব্ব চৌকি থেকে আপনাদের মেয়েদের আসতে বলেছি। তারা এগারোটার মধ্যেই চলে আসবেন।

সকাল সাড়ে নয়টার মধ্যে বাবা, বড় দিদি, দুলাভাই এবং আমার এক কাজিন মদিনা মসজিদে চলে এলেন। শাইখ তাদের কাছ থেকে এই নিশ্চয়তা নিলেন যে, আপনারা সাক্ষাৎ সেরেই চলে যাবেন। কোনো ধরনের ঝামেলা করবেন না। কেননা এখন ওরা আমাদের ধর্ম গ্রহণ করেছে। আর ধর্মের হিফাযত করা আমাদেরও দায়িত্ব। সবচেয়ে উত্তম হলো, তারা যদি আপনাদের সাথে চলে যেতে চায়, তাহলে আমরা বাধা দেবো না। কিন্তু যদি না যেতে চায়, তাহলে আপনারা কোনো ধরনের বিপত্তি সৃষ্টি করবেন না।'

সোয়া এগারোটায় আমরা পেছনের দরজা দিয়ে রুমে প্রবেশ করলাম। পুরো শরীর বোরকাবৃত। হাতে-পায়েও মোজা পরা। আমাদের দেখেই বাবা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। গলায় জড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। দিদিও কাঁদতে শুরু করলেন। তাদের সাথে আমরাও ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। বাবা বললেন, 'মা আমার, ঘরে চল। তোদের ছাড়া আমি যে থাকতে পারছি না।'

'বাবা, আমরা তো ঘরে যেতে পারব না। আমরা যে ইসলাম গ্রহণ করেছি!'

'তোদের ইসলামগ্রহণ আমি মেনে নিচ্ছি। তোরা আমাদের সাথে মুসলিম হয়েই থাকিস। কেউ কিছু বলবে না তোদের। কোনো কাজে কেউ কখনো বাধা দেবে না। তোদের ইচ্ছেমতো সালাত পড়বি, কুরআন শিখবি। সব করবি। তবু ঘরে চল। তোদের ছেড়ে আমি যে এক মুহূর্তও থাকতে পারছি না! ইসলাম কি এ শিক্ষা দেয় যে, পিতা-মাতার অবাধ্য হও! তাদের মনে কষ্ট দাও! চল, ঘরে চল, ঘরের সবাই তোদের চিন্তায় অস্থির হয়ে আছে। সবাই খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। আমি তোদের হাতজোড় করে অনুরোধ করছি।'

Scanned with CamScanner

বাবার কথা শুনে আমি হেঁচকি তুলে কাঁদতে শুরু করলাম। হে আল্লাহ, এ কোন পরীক্ষায় পড়লাম। বাবা বিগলিত কণ্ঠে অনুরোধ করছেন আর আমি কেবল শুনে যাচ্ছি।

বাবা বলেই যাচ্ছেন, 'মা আমার, আমি সবসময় অন্যদের কথার ওপর তোদের কথাকে প্রাধান্য দিয়েছি। তোদের মা তোদের সালাত পড়তে দেখেছে। তোদের ভাই আমাকে তোদের সালাত পড়ার কথা বলেছে। কিন্তু তোরা যখন অস্বীকার করেছিস, তখন আমি তোদের কথাই সত্য বলে মেনে নিয়েছি। তাদের সবার কথা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছি। সেই তোরাই আমার মনে কষ্ট দিলি! তারপরও আমি এখন তোদের সামনে হাতজোড় করে বলছি, ঘরে ফিরে চল।'

আমি বললাম, 'বাবা, তুমি এভাবে এভাবে বোলো না প্লিজ। পরিস্থিতি যেমনই হোক, আমরা কিছুতেই ঘরে ফিরব না। জানি, তোমার মনে অনেক কষ্ট দিয়েছি। তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও প্লিজ।'

উপস্থিত সবার চোখে জল। বাবা তো রীতিমতো অস্থির হয়ে কাঁদছেন। কিন্তু তাদের জন্য যে আমি আমার রবকে ত্যাগ করতে পারি না। আমিও কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে বাবাকে বললাম, 'বাবা, আমরা কিছুতেই ইসলাম ছাড়তে পারব না। আজ যদি ঘরে ফিরে যাই, তাহলে কালই তুমি আমাদের হিন্দু-ঘরে বিয়ে দেবে। অথচ আমাদের জন্য তা হারাম। আমি হারাম-মরণ মরতে চাই না। আমি তোমার জন্যও কল্যাণ কামনা করি। আল্লাহর ওয়াস্তে তুমিও ইসলাম গ্রহণ করো। আমাদের কথা বোঝার চেষ্টা করো প্লিজ।'

রক্তের আত্মীয়দের এমন বিপর্যস্ত চেহারার সামনে নিজেদের সামলে রাখা যে কত কষ্টের, তা শুধু ভুক্তভোগীরাই বলতে পারবে। জীবনে যারা এমন চরম বেদনাবিধুর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে, কেবল তারাই জানে এ ধরনের পরিস্থিতিতে নিজেকে সামলে রাখা কতটা কঠিন। আমি বাইরে বেরিয়ে হাফিজ ভাইকে বললাম, 'আমাদের দ্রুত এখান থেকে নিয়ে চলুন। প্রিয়জনদের আর্তনাদের সামনে আমরা নিজেদের সামলে রাখতে পারছি না।'

হাফিজ সাহেবের বাড়ি ফিরলাম বিষণ্ন মন নিয়ে। ভাবি একটু পর চা নিয়ে এলেন। তার শাশুড়ির কাছে নিয়ে গেলেন। আমাদের কাছে টেনে নিয়ে মাথার ওপর স্নেহের হাত বুলিয়ে দিলেন তিনি। তার চোখ বেয়েও টপটপ করে অশ্রু ঝরছে। তিনি

Scanned with CamScanner

অনেকক্ষণ ধরে দ্বীনের পথে আত্মত্যাগের গুরুত্ব বোঝালেন আমাদের। সেইসাথে, ধৈর্য ও সংবরণের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করলেন।

বিকাল চারটায় করাচির উদ্দেশ্যে যাত্রার সিদ্ধান্ত হলো। আমরা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলাম। দ্রুত খাবার খেয়ে নিলাম। যোহরের সালাত আদায় করলাম। সালাতের পর আল্লাহর কাছে দুআ করলাম, হে আল্লাহ, আমাদের জন্য এই যাত্রাকে বরকতময় করে দিন। সালাতের ভেতরেও চোখ বেয়ে টপটপ করে অশ্রু ঝরছিল।

ঠিক চারটার সময় বাড়ির গেইটে তিনটি গাড়ি চলে এলো। হাফিজ ভাইয়ের সাথে আমরা মাঝখানের গাড়িতে যেয়ে বসলাম। পথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমাদের সামনে একটি ও পেছনে একটি গাড়ি রাখা হয়েছিল। পথের বিভিন্ন পয়েন্টে মাদরাসার ছাত্রদের অবস্থান করতে দেখেছি। তারা বিশেষ ইঙ্গিতের মাধ্যমে রাস্তার ক্লিয়ারেন্স জানিয়ে দিচ্ছে।

আসরের সময় আমরা একটি হোটেলের সামনে যাত্রা বিরতি করলাম। এখানে বেশ কয়েকজন আলিম অবস্থান করছেন। হোটেলের পাশেই চমৎকার কারুকার্য খচিত একটি মসজিদ। মসজিদের ভেতরে মহিলাদের সালাত পড়ার জন্য পৃথক বন্দোবস্ত রয়েছে। আমরা ওই মসজিদে গিয়ে সালাত পড়লাম। কিছুক্ষণ পর এক কিশোর ছেলে আমাদের জন্য চা-বিস্কুট নিয়ে এলো। নাশতা শেষে পুনরায় যাত্রা শুরু। মাগরিবের ঘণ্টাখানেক আগে আমরা প্রবেশ করলাম করাচির সীমানায়।

মাদরাসায় ভর্তি

করাচির সবচেয়ে বড় মহিলা মাদরাসার নাম বিন্নুরি ইন্টারন্যাশনাল মহিলা মাদরাসা। এখানে শাইখ হাফিজুর রহমান সাহেবের এক বন্ধু থাকেন। তার মাধ্যমেই শাইখ হাফিজুর রহমান এই মাদরাসার পরিচালকদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। তাদের পরামর্শে আমাদের এখানে ভর্তি করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাইরে থেকে মাদরাসার সুবিশাল দৃষ্টিনন্দন ভবন দেখে হৃদয় আনন্দে ভরে উঠল। শাইখ হাফিজুর রহমান সাহেব গাড়ি থেকে নেমে সোজা জামিয়া বিন্নুরিয়ার অফিসরুমে চলে গেলেন। ভেতরে ছিলেন মুফতি নাইম সাহেব। হাফিজ ভাই প্রথমে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এরপর ফিরে এসে আমাদের ভেতরে নিয়ে যান।

Scanned with CamScanner

হাফিজ ভাই সারাটা পথ আমাদের পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়ে নিয়ে আসেন। মাদরাসায় পৌঁছে আমরা লক্ষ করি, মাদরাসার সিকিউরিটি ব্যবস্থা অনেক মজবুত। এ জন্য অবশ্য আমাদের একটু কষ্ট পোহাতে হলো। কিছু সময় গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম আমরা। হাফিজ ভাইকেও তখন অপ্রস্তুত ও সংকুচিত মনে হচ্ছিল। অবশ্য পরিচয় দেওয়ার সাথে সাথেই তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়।

অনেক দিন ধরেই আমাদের স্বপ্ন ছিল, কোনো মাদরাসায় ভর্তি হয়ে দ্বীনি ইলম অর্জন করব। মাদরাসার আলোকিত আঙিনায় এসে আমাদের সেই স্বপ্নটি পূরণ হতে যাচ্ছে। এখন আমরা স্বাধীনভাবে মহান আল্লাহর ইবাদত করতে পারব। কিন্তু এরপরও অজানা কোনো কারণে বুকের ভেতরটা ধকধক করছে। আমরা ভীরু পায়ে হাফিজ ভাইয়ের সাথে মাদরাসার ভেতরে প্রবেশ করলাম। হাফিজ ভাই আমাদের মুফতি নাইম সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন। অফিসের একদিকে আমাদের বসতে বলা হলো। আমরা বসে পড়লাম। আমাদের থেকে খানিকটা দূরে হাফিজ ভাই বসলেন। ততক্ষণে শাইখ মাসউদ বেগও অফিসরুমে চলে এসেছেন। এখানে আমাদের জন্মসনদ ও মিরপুরখাস আদালতের সার্টিফিকেট পরীক্ষা করা হলো। অফিসরুমে পিনপতন নীরবতা। আমাদের বুকের ধুকধুকানি ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

মুফতি সাহেব আমাদের সম্বোধন করে বললেন, 'মেয়েরা, আমরা তোমাদের নাম, পরিচয় ও জন্মসনদ খতিয়ে দেখেছি। এরপরও কি তোমরা নিজেদের নাম একবার মুখে বলবে?'

'জি, আমার নাম আয়িশা। আর আমার ছোট বোনের নাম মারইয়াম।'

'কত দিন হলো, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করেছ?'

এ প্রশ্নের উত্তর আগেও বেশ কয়েকজনকে দিতে হয়েছে। মুফতি সাহেবকেও সেই একই কথা বললাম। এবার তিনি একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন, 'এই পরিবর্তনের পেছনে প্রেমঘটিত কোনো ব্যাপার-স্যাপার নেই তো আবার!'

প্রশ্ন শুনেই মাথাটা ভোঁ-ভোঁ করে উঠল। মনে মনে বললাম, ইন্নালিল্লাহ, এমন নেতিবাচক মানসিকতা কোত্থেকে এলো! পরক্ষণেই আবার ভাবলাম, মুফতি সাহেব পোড়খাওয়া অভিজ্ঞ মানুষ। তিনি তার অভিজ্ঞতায় এমন অনেক কিছুই হয়তো দেখেছেন। সে কারণেই আমাদের ভালোভাবে যাচাই করতে চাইছেন। তাই প্রশ্নের

Scanned with CamScanner

শব্দ শুনে একটু আহত হলেও খানিক বাদের নিজেকে সামলে নিলাম। চোখের কোণে কিছু অশ্রুকণাও চলে এলো। আমি বললাম, 'যদি প্রেমঘটিত ব্যাপার থাকত, তাহলে তো আর এখানে আসার প্রয়োজন ছিল না। প্রেমিকের কাছেই যেতাম।'

মুফতি সাহেব আমার উত্তরে মাথা নেড়ে সমর্থন জানালেন। মনে মনে বললাম, 'আল্লাহকে ভালোবেসেছি বলেই তো আল্লাহর ঘরের আঙিনায় এসেছি। হে আল্লাহ, আপনি অঙ্গীকার করেছেন, আপনাকে যে সম্মান করবে, আপনি তাকে সম্মানিত করবেন। হে আল্লাহ, আপনার অঙ্গীকার পূর্ণ হোক। আপনার নেক বান্দাদের কাতারে আমাকে শামিল করে নিন। আমিন।'

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আশ্বস্ত হওয়ার পর মুফতি সাহেব মহিলা বিভাগে প্রবেশের অনুমতি-সংবলিত একটি স্লিপ দিলেন। পরিচালক সাহেবের দেখানো পথ ধরে আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম। আল-হামদু লিল্লাহ, তখন মনে হচ্ছিল, নানা জায়গায় ঘুরপাক খাওয়া দিগ্‌ভ্রান্ত পাখি এবার আপন নীড়ে ফিরেছে। মহিলা পরিচালক আমাদের উষ্ণ অভিনন্দন জানালেন। অভ্যন্তরীণ অফিসরুমে নিয়ে বসালেন। মুফতি সাহেবের স্ত্রী আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে বললেন, 'মাদরাসার আঙিনায় তোমাদের শুভেচ্ছা জানাই। তোমাদের ইসলামগ্রহণের জন্য আমার নিজের পক্ষ থেকে এবং মাদরাসার সকল ছাত্রীর পক্ষ থেকে মুবারকবাদ। ইন শা আল্লাহ, এখানে তোমরা সবসময় আমাদের পাশে পাবে। তোমাদের বেশ ক্লান্ত মনে হচ্ছে। হাত-মুখ ধুয়ে খেতে এসো। তোমাদের জন্য খাবার প্রস্তুত। মনে রাখবে, এখানে আমি তোমাদের মা। আর সকল ছাত্রী তোমাদের বোন। খাওয়া শেষ হলে আরাম করবে।'

কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠল, বললাম, 'আল-হামদু লিল্লাহ। আল্লাহর যতই শোকর করি না কেন, যথাযথ হক আদায় হবে না। তিনি আমাদের শান্তির নীড়ে পৌঁছে দিয়েছেন। আপনাদের আন্তরিকতা দেখে আমাদের সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে গেছে।'

এরপর তিনি বিশেষ শ্রেণির মেয়েদের ডেকে বললেন, 'এই মেহমানদেরকে তোমাদের সাথে রাখবে। বোনের মতো সম্মান করবে।'

আমরা ছাত্রীদের সাথে তাদের রুমে গিয়ে প্রথমে ওযু করলাম। দুই রাকাত সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানালাম। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই আমাদের সাথে এমনভাবে মিশে গেল যেন আমরা তাদের অনেক দিনের চেনা। তাদের সাথে

Scanned with CamScanner

সালাত আদায়ের পর যখন বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিলাম, তখন মনে হলো, দীর্ঘ তিন বছরের বয়ে বেড়ানো ক্লান্তি ও অবসাদ নিমিষেই দূর হয়ে যাচ্ছে। আজই প্রথম নিজেকে আদ্যোপান্ত মুসলিম মনে হচ্ছে। এত দিনের বন্দি আত্মা আজই প্রথম নিজেকে মুক্ত বিহঙ্গ বলে বিশ্বাস করছে। আল-হামদু লিল্লাহ।

অকল্পনীয় ভালোবাসা

মাগরিবের সালাতের পর মুফতি সাহেবের স্ত্রী আমাদের ডেকে পাঠালেন। ততক্ষণে দিনের পরিচালিকা বাসায় চলে গেছেন। রাতের পরিচালিকা এসেছেন। তার অফিসরুমে একজন বয়স্ক মহিলার সাথে সাক্ষাৎ হলো। ভদ্রমহিলা আমাদের সাথে দেখা করতেই এখানে ছুটে এসেছেন। তিনি প্রচণ্ড ভালোবাসার সাথে আমাদের জড়িয়ে ধরলেন। বেশ কিছুক্ষণ গলার সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রাখলেন। ওই মহিলার অকৃত্রিম স্নেহের স্পর্শে মনে হলো, আমাদের গর্ভধারিণী জননীই বুঝি আমাদের জড়িয়ে ধরে আছেন। আমরা কিন্তু খালি হাতে এই হোস্টেলে উঠেছিলাম। একটা মেয়ের যত ধরনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র লাগতে পারে, তিনি তার সমুদয় এনে আমার হাতে তুলে দিলেন। তার আচরণ দেখে মনে হলো, এগুলো দেওয়া তার কর্তব্য। তিনি আমাদের ওপর কোনো দয়া করছেন না; বরং তার কর্তব্য পালন করছেন।

এখানে এসে এমন আরও কয়েকজন সুহৃদ মানুষের দেখা পেলাম, যাদের সহযোগিতার মনোভাব দেখে আমরা যারপরনাই বিস্মিত হয়েছি। তাদের হৃদ্যতা ও ঔদার্য আমাদের চিন্তা ও কল্পনারও বহু ঊর্ধ্বে ছিল।

একটা মেয়ের হোস্টেলে থাকা-খাওয়ার জন্য যে পরিমাণ স্বাভাবিক খরচ লাগে, তার তুলনায় এখানে অনেক কম ফি ধার্য করা। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রুম, বেড, লেপ, তোশক, গালিচা এবং এ জাতীয় অন্যান্য সামগ্রীর কারণে যে পরিমাণ মাসিক ফি ধার্য হওয়ার কথা, ছাত্রীদের থেকে তার তুলনায় অনেক কম টাকা নেওয়া হয় এখানে। ছাত্রীদের কখনোই ফি কিংবা মাসিক বেতন নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। আমাদেরও করতে হচ্ছে না। আমরা এখানে মহান আল্লাহর দয়া দেখতে পেয়েছি। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ, বিশেষত মুফতি সাহেব, আমাদের যাবতীয় ব্যয়ভার ফ্রি করে দিয়েছেন। ফলে এখানে এসে এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের অর্থকড়ি নিয়ে চিন্তা করতে হয়নি।

Scanned with CamScanner

মুফতি সাহেব একজন ধীমান অভিজ্ঞ মানুষ। তিনি বুঝে ফেলেছিলেন, আমাদের শিক্ষাকার্যক্রম কোন পথে এগিয়ে নিতে হবে। তাই তিনি তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমাদের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছেন। তিনিই আমাদের সব ধরনের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত রেখে নির্বিঘ্নে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার সুবন্দোবস্ত করে দিলেন।

মাদরাসায় এসে মোটামুটি স্বাভাবিক হওয়ার পর পূর্ণ মনোযোগের সাথে দ্বীনি ইলম শেখার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। পড়াশোনার ব্যস্ততার মাঝেও চারপাশে দৃষ্টি চলে যেত। তখন লক্ষ করতাম, প্রতিটি ছাত্রীর মনেই বাবা-মায়ের প্রতি গভীর অনুরাগ বিরাজ করে। তারা সময়ে-অসময়ে বাড়ির বিভিন্ন স্মৃতিচারণ করছে। আসলে মা-বাবা এমন ব্যক্তিত্ব, যাদের কথা কারও পক্ষেই ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। আমরাও এর ব্যতিক্রম নই। আমাদেরও প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে তাদের নানা স্মৃতি ভেসে ওঠে। সবসময় মহান আল্লাহর কাছে দুআ করি, 'হে আল্লাহ, আমাদের বাবা-মাকে হিদায়াত দান করুন। আমরা যেন তাদের সাথে একত্রে থেকে আপনার ইবাদত করতে পারি, সেই ব্যবস্থা করে দিন।'

একরাতে স্বপ্নে দেখলাম, বাবা ও বড় ভাইয়ারা একসঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আমি তাদের একটা ইসলামি বই উপহার দিয়েছি। তারা বেশ আগ্রহ নিয়ে বইটি পড়ছেন।

স্বপ্নের মাঝে আমি এত বেশি উৎফুল্ল হয়ে গেলাম যে, আনন্দের আতিশয্যে তখনই আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তাহাজ্জুদের সময় হয়ে গেছে। আসলে আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদের নানাভাবে কাছে ডাকেন। তাই বিশেষ মুহূর্তগুলোতে তাদের জাগিয়ে দেন। আল্লাহু আকবার।

আমি উঠে নফল সালাত পড়লাম। দু-চোখের অশ্রু ফেলে মা-বাবা ও ভাই-বোনদের জন্য হিদায়াতের দুআ করলাম। আমি বিশ্বাস করি, আল্লাহ অবশ্যই আমার দুআ কবুল করবেন। তবে কখন করবেন, সেটা কেবল তিনিই জানেন।

সবাই বলে, 'স্বপ্ন হলো সাক্ষাতের একটি মাধ্যম।' আমার জীবনে এই প্রবচনটি বহুবার সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ জন্য স্বপ্নের প্রতি আমি একটু বেশিই দুর্বল। আজ যেমন স্বপ্ন দেখেছি, বাবা, দিদি ও ভাইয়ারা আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য এই মাদরাসায় চলে এসেছেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে রুমের সবাইকে স্বপ্নের কথা বললাম। দিন না গড়াতেই আমার স্বপ্ন সত্য বলে প্রমাণিত হলো। ঠিক

Scanned with CamScanner

পাঁচটায় ইন্টারকমে আমার ও মারইয়ামের নাম ধরে ঘোষণা করা হলো, 'তোমাদের আত্মীয় তোমাদের সাথে দেখা করতে এসেছেন। কাজেই তোমরা সাক্ষাতের জন্য পরিচালিকা সাহেবার রুমে চলে এসো।' তখন আমাদের আনন্দ দেখে কে! ঘোষণা হওয়ামাত্রই সেখানে চলে গেলাম। স্বপ্নে যাদের দেখেছিলাম, তারা সবাই এসে হাজির হয়েছেন। বাবাকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগলাম। বারবার বলতে চাইছি, 'বাবা, তুমি ঠিক আছ তো?' কিন্তু কেন যেন গলা থেকে শব্দ বেরুচ্ছে না। মারইয়ামও কাঁদছে দিদির গলা জড়িয়ে ধরে।

বাবা বললেন, 'তোরা এখানে কোথায় চলে এলি? তোরা কি জানিস, তোরা চলে আসার পর পুরো ঘর বিরান হয়ে গেছে। তোদের মা তার বাবার বাড়িতে চলে গেছে। সে মানুষের কাছে মুখ দেখাতে পারছে না। বংশের সবাই তাকে ধিক্কার দিচ্ছে। কারও সামনে মুখ দেখাবার জো নেই। সবাই অনুমান করে বলছে, তোমাদের মেয়ে কোনো মোল্লার সাথে পালিয়ে গেছে। তোরা কল্পনাও করতে পারবি না, তোদের জন্মদাতা বাবাকে কত বড় কলঙ্ক দিয়েছিস। তোদের মা তো আমার জীবন দুর্বিষহ করে ফেলেছে। উঠতে-বসতে আমাকে ধিক্কার দিয়ে বলছে, আমার অতিরিক্ত আদিখ্যেতা আর প্রশ্রয়ের কারণেই এমন কলঙ্কিত দিন দেখতে হচ্ছে তাকে। তোদের হাতজোড় করে বলছি, ঘরে চল। ভগবানের দোহাই দিয়ে বলছি, ঘরে চল।' কথাগুলো বলার সময় বাবা আমাদের সামনে আদতেই হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছিলেন।

আমি তখন বাবার পায়ে পড়ে বললাম, 'বাবা, আমাদের ক্ষমা করে দাও, প্লিজ! আমরা কীভাবে আল্লাহর সাথে নাফরমানি করি! আমাদের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা তো আল্লাহ। তিনিই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তোমার মাধ্যমে পৃথিবীতে আসার ব্যবস্থা করেছেন মাত্র। তাঁর অবাধ্যতা করার ক্ষমতা আমাদের কারও নেই। একদিন এই পৃথিবীতে আয়িশার নাম থাকবে না; মোহনদাসের নামও থাকবে না। থাকবেন শুধু আল্লাহ। বাবা তুমি কেন বুঝতে চাইছ না!'

বাবার হাহাকার আমাকে দ্বিতীয় বারের মতো দুর্বল করে ফেলল। আমি কায়মনোবাক্যে দুআ করছিলাম, 'হে আল্লাহ, পৃথিবীর এই বিচ্ছেদ, রক্তের বন্ধনের এই ছিন্নতা আপনি কবুল করুন।'

আবাসিক ভবনে ফিরে এসে আমি আর মারইয়াম অনেকক্ষণ কাঁদলাম। দূর থেকে পরিচালিকা সাহেবা-সহ অন্য ছাত্রীরাও কাঁদছিল। কেউ এগিয়ে এসে আমাদের

Scanned with CamScanner

অশ্রু মুছে দিল। কেউ পানি বাড়িয়ে দিল। তাদের সহায়তায় আমরা কোনোমতে স্বাভাবিক হলাম।

স্বপ্ন ও সাক্ষাৎ

আমরা হিফযুল কুরআন বিভাগে ভর্তি হয়েছি। এই বিভাগে সাধারণত দুপুর সাড়ে বারোটায় বিরতি দেওয়া হয়। এ সময় আমরা খাবার খেয়ে বিশ্রাম নিই। বিকেলেও আমাদের ক্লাস হয়। তখন আমার চোখে তন্দ্রা চলে আসে। দুচোখের পাতা এক হতেই স্বপ্নে দেখি, আমার পুরো পরিবার আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। শুধু মা আসেননি। বাবাকে দেখে আমাদের ওপর ভীষণ অসন্তুষ্ট মনে হচ্ছে।

আমি মারইয়ামকে ডেকে মাত্র স্বপ্নের বিবরণ বলছি, ততক্ষণে পরিচালিকা সাহেবা চলে এলেন। বললেন, 'তোমাদের পরিবারের লোকজন এসেছে।' তখন ক্লাসের অন্য মেয়েরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি নিজেও হতবাক হয়ে ভাবছিলাম যে, চোখের পলকে স্বপ্ন কীভাবে সত্যি হয়!

কক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম বাবা, মেজো ভাই, দিদি, দুলাভাই আর দীপক বসে আছে। আমি সালাম দিয়ে প্রবেশ করে নীরবে একপাশে বসে পড়লাম। তারা সবাই রাজ্যের ক্ষোভ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। কারও কারও চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুও ঝরছে। আমার চোখ থেকেও কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

আমাকে কাঁদতে দেখে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই আবার কীসের জন্য কাঁদছিস! কান্না তো আমাদের ভাগ্যের লিখন। তুই আমাদের কাঁদতে বাধ্য করেছিস। আমার বিশ্বাস ভেঙেছিস। তোর তো উল্লাস করার কথা। তুই আবার কাঁদছিস কেন?'

আমি মনে মনে বললাম, 'বাবা, কীভাবে আমি তোমাকে আমার ভালোবাসার গভীরতা দেখাব! পিতার ভালোবাসা কী জিনিস, তা আমি আল্লাহর ভালোবাসার জগতে এসে দ্বিগুণ বুঝতে পেরেছি।' কিন্তু মুখ ফুটে কোনো কথা বললাম না।

দিদি তখন বললেন, 'মনিকা, মাদরাসার এই মেয়েরা একসময় নিজেদের বাড়িতে ফিরে যাবে। কিন্তু তুই ফিরবি কোথায়? তোর ভবিষ্যৎই-বা কী? এই মৌলভি কোথায় তোর সদ্গতি করবে? তা কি কোনোদিন ভেবেছিস?'

Scanned with CamScanner

আমি নির্লিপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিলাম, 'সেটা আল্লাহ দেখবেন। কাল তোমার সাথে কী হবে, তা কি তুমি বলতে পারবে?'

বাবা আমার কথা থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'মনিকা, শেষবারের মতো বলছি, বাড়ি চল। আমার অসুস্থতার প্রতি একটু দয়া কর।'

মেজো ভাই গুড্ডু বলল, 'মনিকা, তোর পা ধরে বলছি, বাড়ি চল। তোকে ছাড়া আমরা কেউ থাকতে পারছি না। তুই যেভাবে বলবি, সবাই সেভাবেই চলবে। তুই তো ঘরে বসেও ইসলামি শিক্ষা অর্জন করতে পারবি। কেউ তোকে বাধা দেবে না। আমি করাচিতে বাসা নিতে চাচ্ছি। তাছাড়া আমি নিজেও ইসলামগ্রহণের কথা ভাবছি। চল, আমরা দুজন একসঙ্গে মাদরাসায় ভর্তি হব।'

আমি তখন মুখের ওপর হাসির রেখা টেনে বললাম, 'আমার খুব খুশি লাগছে, তুমি মুসলিম হতে চাইছ। ভাইয়া, এ কাজে দেরি করা ঠিক হবে না। তুমি এখনই কালিমা পাঠ করে মুসলিম হয়ে যাও। কালকের অপেক্ষা কেন করবে? আর এ মাদরাসায়ই ভর্তি হয়ে যাও। আমি প্রতিদিন তোমার সাথে দেখা করব।'

উত্তরে ভাইয়া বলল, 'আগে তুই একটি বারের জন্য বাসায় চল। আমি কথা দিচ্ছি, তোর সাথে আমিও চলে আসব।'

তার উত্তর শুনে আমার মুখ থেকে হাসি উবে গেল। আমি বললাম, 'না ভাইয়া, আমাকে ক্ষমা করে দাও। আয়িশা এখান থেকে পূর্ণ শিক্ষা সম্পন্ন না করে কোথাও যাবে না।'

বাবা তখন ভাইয়াকে বললেন, 'না, এই মেয়ে আর কথা শুনবে না। ভগবান ওকে পাষাণী বানিয়ে ফেলেছে। ওকে ছেড়ে দাও।'

ভাইয়া আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল, 'তোকে ছাড়া বাসায় এক মুহূর্তও ভালো লাগে না। আমি নিয়মিত আসব। ফোনও করব।'

ভাই আমাকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদল। আমারও একই অবস্থা। এখনই বুঝি চোখ থেকে অশ্রুর বদলে রক্ত গড়িয়ে পড়বে। তাই নির্মমভাবে নিজেকে সংবরণের চেষ্টা করতে লাগলাম। যত দ্রুত সম্ভব রুমে ফিরে যেতে হবে। ফিরে যাওয়ার সময় পেছনে তাকিয়ে দেখলাম, ভাইয়া আগের মতোই আমার দিকে কান্নাভরা চোখে

Scanned with CamScanner

অপলক তাকিয়ে আছে।

বাবা তখন আমার কাছে এসে বললেন, 'মনিকা, এখন আমি মামলা করতে যাচ্ছি। আশা করি, কোর্টে তুই আমাদের পক্ষে বয়ান দিবি।'

এ কথা বলে বাবা সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

করাচি হাইকোর্টে মামলা

বাবা আমাদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য হায়দারাবাদ হাইকোর্টে মামলা দায়ের করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহর কী মর্জি! শেষমেশ তিনি করাচি হাইকোর্টে মামলা করলেন। আল্লাহ না করুন, তিনি যদি হায়দারাবাদ হাইকোর্টের বেঞ্চে মামলা করতেন, তাহলে আমরা দুটি সমস্যায় পড়তাম। একে তো সেখানে আমাদের কোনো নিরাপত্তা থাকত না। দ্বিতীয়ত সেখানে দক্ষ বিচারপতি আর উকিলও পাওয়া যেত না।

মামলাটা দায়ের করা হলো শাইখ হাফিজুর রহমান ও মাদরাসার পরিচালক জনাব শাইখ মাসউদ বেগের নামে। বাবার দাবি এ দুজন পরিকল্পনা করে তার কিশোরী মেয়েদের অপহরণ করেছে এবং জোর করে করাচির জামিয়া বিন্নুরিয়া ইন্টারন্যাশনালে রেখে দিয়েছে। আমাদের নাকি জামিয়া ইন্টারন্যাশনালে থাকার কোনো প্রকার ইচ্ছে নেই। আমরা নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেখানে অবস্থান করছি। তাই মহামান্য আদালতের কাছে বাবার আর্জি—তার মেয়েদের যেন তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

মামলার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি মিসেস কায়সার ইকবাল একটা অর্ডার জারি করলেন। আদালতের পরিদর্শককে জামিয়া বিন্নুরিয়া ইন্টারন্যাশনালের কর্তৃপক্ষের সাথে দেখা করার এবং আমাদের খুঁজে বের করে অভিভাবকের হাতে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন তিনি। সেই সাথে আদালতে ডেকে পাঠালেন শাইখ হাফিজুর রহমান ও শাইখ মাসউদ বেগকে। এরপর কেসের ফাইল পাঠিয়ে দিলেন মিরপুরখাসের এসপি জনাব মুনির আহমাদ শেখের কাছে।

আদালতের নির্দেশে দায়িত্বশীল কর্মকর্তাগণ জামিয়া বিন্নুরিয়া ইন্টারন্যাশনালে হাজির হলেন। আমাদেরকে নিজেদের তত্ত্বাবধানে এনে, অভিভাবকের হাতে তুলে দেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আমরা সেসময় মাদরাসায় ছিলাম না বলে বেঁচে যাই। পরিদর্শকগণ আমাদের না পেয়ে ফিরে যায় তখন।

Scanned with CamScanner

এরপর কেসটা সরাসরি বিচারপতি মিসেস কায়সার ইকবালের হাতে চলে যায়। মামলা পরিচালনার জন্য শাইখের পক্ষ থেকে উকিল হিসেবে জনাব ইশতিয়াক মায়মান সাহেব ও জনাব হকনাওয়াজ তালপুর সাহেব নিয়োগ লাভ করেন। ইশতিয়াক মায়মান সাহেব অস্ট্রেলিয়া থেকে আইনশাস্ত্রের ওপর উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে আইন পেশায় যোগ দেন। তিনি এই মামলার জন্য প্রচুর শ্রম ও সময় দিয়েছেন, প্রচুর মেধা খাটিয়েছেন। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

ইশতিয়াক আহমাদ মায়মান সাহেব মিসেস কায়সার ইকবালের জারিকৃত অর্ডার দেখে ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি ও আরেকজন ব্যারিস্টার আমার আর মারইয়ামের পক্ষ থেকে একটি নতুন কেস দাখিল করবেন। দুজনই অনেক উঁচুমানের উকিল। তাদের সম্মানী মাদরাসা বা অন্য কোনো হিতাকাঙ্ক্ষীর পক্ষে বহন করা সম্ভব ছিল না। তবে তারা আমাদের বললেন, 'এই মামলায় আমরা ফি হিসেবে শুধু একটি জিনিসই চাই। সেটা হলো আপনাদের দুআ। আপনারা আমাদের আখিরাতের নাজাতের জন্য দুআ করবেন। আমাদের এই কাজটি যেন সেদিন আমাদের পাশে থাকে, যেদিন নিজের নেক আমল ছাড়া অন্য কিছু সাথে থাকবে না।'

মহান আল্লাহ তাদের দুজনকে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন। আল্লাহর রহমতে তাদের মাধ্যমেই আমাদের পক্ষে মন্দিরের বলয় থেকে মসজিদের আলোকিত আঙিনায় আসা সম্ভবপর হয়েছে।

শাইখ হাফিজুর রহমান উচ্চ আদালতে এসে বয়ান দিলেন, 'আমার কাছে মিরপুরখাস থেকে অসংখ্য হিন্দু নারী-পুরুষ এসে ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর আদালতে গিয়ে হলফনামা প্রদান করে। তারপর তারা কোথায় যায়, কী করে— সেটা জানা আমার দায়িত্বের আওতায় পড়ে না।'

মাসউদ বেগ সাহেবও একইরকম বয়ান দিলেন। তিনি বললেন, 'আমাদের মাদরাসায় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ছেলে-মেয়েরা পড়তে আসে। এটি একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান। এখানে যোগ্যতা অনুসারে ভর্তি করানো হয়। কোনো শিক্ষার্থী যদি আমাদের দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয় তার মানে কি এই, আমরা তাদের অপহরণ করে এনেছি? প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রছাত্রী স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে এখানে পড়াশোনা করতে আসে। যদি তাদের কেউ এখান থেকে চলে যায় তাহলে আমরা তাকে জিজ্ঞেসও করি না, কোথায়

Scanned with CamScanner

যাচ্ছ? তাছাড়া এটা জানা কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্বও নয়। এই মেয়ে-দুটোও আমাদের কাছে ভর্তি হতে এসেছিল। কিন্তু আমাদের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে হলে নির্দিষ্ট যোগ্যতার অধিকারী হতে হয়। আমাদের এখানে ভর্তি হতে পারবে কি না—এ নিয়ে মেয়ে দুটোও শঙ্কিত ছিল। তারা এখন আর আমাদের প্রতিষ্ঠানে নেই।'

আল্লাহর রহমতে আমরা সে সময় মাদরাসায় ছিলাম না। সেখানে না রাখার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করেছেন। আসলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই তো বান্দাদের বিপদ থেকে রক্ষা করেন। কাকে কোন পর্দার আড়ালে রেখে রক্ষা করবেন, তা তিনিই ভালো জানেন।

আমাদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের পরিবার চেষ্টা করেই যাবে এ কথা মুফতি সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন। বিষয়টি তাকে খুব দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল। তিনি তার বন্ধুদের সাথে পরামর্শ করলেন। বেশ কজন আইন বিশেষজ্ঞের সাথেও কথা বললেন। এদিকে কোর্ট-কাচারির নাম শুনলেই আমাদের মুখ শুকিয়ে যেত। ভাবতাম, আদালতে কীভাবে বাবা-মায়ের মুখোমুখি হব? কীভাবে নিজের পরিবারের বিপক্ষে কথা বলব? যেকোনো ভদ্র পরিবারের সন্তানই তো এগুলো এড়িয়ে চলতে চায়। কিন্তু আমাদের আর কিছুই করার ছিল না। মা-বাবাই আমাদের টেনেহিঁচড়ে কোর্ট-কাচারিতে হাজির করছেন। পরামর্শ শেষে মুফতি সাহেব সিদ্ধান্ত জানালেন যে, আমরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় হাইকোর্টে হাজির হয়ে নিজেদের হলফনামা দায়ের করব। এরপর তিনি আইন বিশেষজ্ঞদের সাথে যোগাযোগ করলেন। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মুশতাক মায়মান সাহেব কয়েকদিন খাটাখাটুনি করে আমাদের কেস তৈরি করলেন। ব্যারিস্টার মানসুরুল আরিফিনের মাধ্যমে কেসটি দাখিল করা হলো, যাতে উচ্চ আদালতে প্রদত্ত হলফনামা আমাদের মা-বাবাকে আশ্বস্ত করে।

মারইয়াম ও আমাকে করাচি হাইকোর্টের দুজন বিচারপতির মুখোমুখি হতে হলো। নিজেকে একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মুসলিম হিসেবে আদালতে হলফনামা প্রদান করলাম। এ কথাও বললাম যে, আমাদের কেউ অপহরণ করেনি। আমরা স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে এ মাদরাসায় ইসলামি শিক্ষা অর্জন করার জন্য এসেছি।

অবশ্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইচ্ছায় বাবার নিয়োগ দেওয়া মহিলা উকিলের কাছ থেকেও সাহায্য পেয়েছি আমরা। এই ভদ্রমহিলা আদালতে আমাদের সঠিক বয়স জানিয়ে দিলেন। এ কারণে আমরা আইনি নিরাপত্তা পেয়েছি। যদি

Scanned with CamScanner

তিনি আমাদের সঠিক বয়স স্বীকার না করতেন, তাহলে আমাদের চাইল্ড কেয়ার বা সেইফজোনে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। আল্লাহ সব দিক থেকে আমাদের সাহায্য করেছেন। আল-হামদু লিল্লাহ।

সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করে আদালত আমাদের সাময়িকভাবে মাদরাসায় অবস্থান করার অনুমতি দেয় এবং পরবর্তী শুনানিতে আমাদের পিতা-মাতাকে হাজির হওয়ার নোটিশ জারি করে।

আমরা মাদরাসায় এসে কর্তৃপক্ষকে ওই অনুমতিপত্র দেখাই। তারা আমাদের অভিভাবকদের দায়েরকৃত মামলার পরবর্তী শুনানিতে পত্রটি দায়িত্বশীল বেঞ্চের সামনে উপস্থাপন করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আদালত তাদের দায়েরকৃত মামলাটি খারিজ করে দেন। ফলে আমরাও খানিকটা নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পাই। অবশ্য তখনো আমাদের ধৈর্য ও ঈমানের পরীক্ষা শেষ হয়নি। আরও অনেক কিছুর মুখোমুখি হওয়ার বাকি ছিল।

বেদনা মধুর হয়ে যায়

বড় ভাইয়া ও মেজো ভাইয়া আবারও মাদরাসায় এসে হাজির। আগের মতোই তারা আমাদের ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য বলছেন। তাদের সেই একই কথা, 'মনিকা, ঘরে চল। তোদের ছাড়া বাড়িটা খাঁখাঁ করছে। মা সবকিছু ছেড়েছুড়ে মন্দিরে চলে গেছেন। বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমরাও ভালো নেই। বাড়ি ফিরে চল বোন। প্লিজ।'

আমি তখন বললাম, 'ভাইয়া, আমরা এখান থেকেই মায়ের জন্য দুআ করব। বাবার জন্যও দুআ করব। আর তোমাদের অনুরোধ করছি, বাবাকে ভালো কোনো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। ভালোভাবে দেখাশোনা করো। বাবার জন্য আমাদের খুব চিন্তা হয়। আর তোমরাও ইসলামের ছায়াতলে এসো। শান্তি পাবে। প্লিজ, আমাদের কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করো। এ জীবন আর কদিনের? জান্নাতের মহাপুরস্কার পা দিয়ে পিষে নষ্ট কোরো না। পরে আফসোস করতে হবে।'

উত্তরে ভাইয়া বলল, 'জান্নাত পাওয়ার জন্য যদি নিজের পরিবারকে, নিজের আত্মীয়-স্বজনকে ছেড়ে যেতে হয়, তাহলে দরকার নেই এমন জান্নাতের। তোর জান্নাত নিয়ে তুই পড়ে থাক। বাবা-মাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা কোন হাদিসে বলা আছে? ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা তো আমরাও করেছি। আর শোন, এক মাস

Scanned with CamScanner

পর আমরা মিরপুরখাস ছেড়ে ইন্ডিয়া চলে যাব। যাওয়ার সময় শুধু তোদের নিয়ে আফসোস থাকবে। তোরা আমাদের সাথে গেলি না। কষ্টটা এখানেই যে, তোরা আমাদের ছেড়ে নিজেদের মনমতো সুখের ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছিস।'

গলাটা শুকিয়ে এসেছিল। কান্নাভেজা চোখে এক গ্লাস পানির সন্ধানে উঠে গেলাম। ভাইয়া তখন মারইয়ামের মুখোমুখি। ভাইয়া বলল, 'নীলম, তুই তো আমাদের অনেক আদরের বোন। আমাদের সাথে চল। মনিকা তোকে ধ্বংস ছাড়া কিছুই দিতে পারবে না। বাকি জীবন তোকে তোর আত্মীয়-স্বজনের জন্য ছটফট করতে হবে।'

মারইয়াম বিষণ্ন মুখে উত্তর দিল, 'ভাইয়া, আমিও এখন মুসলিম। তোমাদের কাছে অনুরোধ করছি, তোমরাও ইসলাম গ্রহণ করো। আমরা তোমাদের জন্য অনেক কষ্ট পাই। বাবা-মায়ের কথা ভেবে আমাদের খারাপ লাগে। তোমরা এখানে চলে এসো প্লিজ। বাবাকেও সাথে এনো। সবাই ইসলাম গ্রহণ করো।'

ভাইয়া তখন তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, 'চুপ কর! সবসময় খালি ইসলাম, ইসলাম আর ইসলাম! তোদের এই ফালতু কথা বন্ধ কর। তোদের বকবক শুনে শুনে আমাদের কান পচে গেছে। খবরদার, এরপর থেকে ইসলামগ্রহণের ব্যাপারে একটি কথাও বলবি না।'

ভাইয়ার এই উত্তর শুনে আমার মনের পুরোনো সন্দেহ সত্য হলো। বুঝতে পারলাম, সেদিন বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা আমাদের মিথ্যে কথা বলেছে। আমাদের সাথে প্রতারণা করতে চেয়েছিল।

ভাইয়ারা চলে গেল। কিন্তু দুশ্চিন্তা আমাদের পিছু ছাড়ল না। বাবা আবার আদালতে গেলেন। হাইকোর্টে এই মর্মে নতুন একটি মামলা দায়ের করলেন—

'মাদরাসা কর্তৃপক্ষ আমাদের মেয়েদের জোরপূর্বক আটকে রেখেছে। গায়ের জোরে তাদের দিয়ে স্বীকারোক্তি দেওয়াচ্ছে। তারা কখনোই আমাদের একাকী দেখা করতে দেয় না। তাদের সাথে দেখা করার সময় আমাদের সাথে অবশ্যই কোনো পুরুষ বা মহিলা পরিচালক বসিয়ে রাখে। ফলে আমরা আমাদের সন্তানদের সাথে একাকী মন খুলে কথা বলতে পারি না। বিজ্ঞ আদালত যেন আমাদের একাকী দেখা করার সুযোগ করে দেন এবং মেয়েদের আমাদের সম্মুখে স্বীকারোক্তিমূলক বয়ান দেওয়ার নির্দেশ করেন।'

Scanned with CamScanner

আদালত তাদের আর্জি গ্রহণ করল। খবরটা শুনে আমরা ভীষণ কষ্ট পেলাম। আমাদের ইসলামগ্রহণের কথাটা তারা তিন বছর আগে থেকেই জানেন। এরপরও তারা আমাদের আবার আদালতে টেনেহিঁচড়ে নিতে চাইছেন!

নতুন মামলার কারণে আমাদের হাইকোর্টে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই দুর্দিনে মুফতি সাহেব-সহ আরও অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী সর্বক্ষণ আমাদের সঙ্গ দিয়েছেন। সর্বাত্মক সাহায্য করেছেন। আমরা তাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। মহান আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন।

আদালতে মুখোমুখি হওয়ার আগে আরও একবার আমার পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ হলো। আমি এটাকে বলব 'রাজকীয় সাক্ষাৎ'। এই সাক্ষাতে শুধু আমার পরিবারের সদস্যরাই উপস্থিত ছিলেন না, বরং প্রাদেশিক মন্ত্রী, সাবেক এমপিএ, সংখ্যালঘুদের সিটি কাউন্সিলর-সহ নামিদামি অনেক মিডিয়া ব্যক্তিত্বও ছিলেন। মুফতি নাইম সাহেব তাদের উষ্ণ সংবর্ধনা জানিয়ে গ্রহণ করেন।

আমরা পূর্ণ পর্দার সাথে তাদের মুখোমুখি হই। অনেক সময় ইচ্ছে না থাকলেও মানুষকে অপ্রিয় পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। আমাদেরও হতে হয়েছে। ততদিনে একাধিক বার এ জাতীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম বলে বিষয়টি আমাদের সয়ে গিয়েছিল। সেই সাথে খানিকটা দুঃখও লেগেছিল। আমাদের পরিবারই আমাদের এমন অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখে ঠেলে দিয়েছে।

অভ্যর্থনা জানানোর পর মুফতি সাহেব সস্নেহে তাদের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। এরপর বলেন, 'মা, এ সকল অতিথি তোমাদের কিছু প্রশ্ন করবেন। তোমরা সম্পূর্ণ নির্ভয়ে তোমাদের সিদ্ধান্ত তাদের জানিয়ে দেবে। তোমাদের ওপর কোনো ধরনের চাপ নেই। মাদরাসার পক্ষ থেকে তো নেই-ই; এমনকি তোমাদের অভিভাবকদের পক্ষ থেকেও নেই। তোমরা তোমাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন।'

উত্তরে আমি বললাম, 'প্রথমে আমি আমার বাবা, অভিভাবক ও সম্মানিত অতিথিদের স্বাগত জানাই। আপনারা আমাদের কথা মনে রেখেছেন, এ কথা ভেবে আমি অনেক আনন্দবোধ করছি। ইন শা আল্লাহ, আমরা এখন আপনাদের পূর্ণ আশ্বস্ত করার চেষ্টা করব।'

তখন এমপিএ ড. রমেশ বলেন—

Scanned with CamScanner

'তোমরা দুজন কি মনিকা ও নীলম?'

'জি, একসময় ছিলাম। কিন্তু এখন আমরা মুসলিম। আমার নাম আয়িশা আর আমার ছোট বোনের নাম মারইয়াম।'

'তোমরা তোমাদের বাড়িঘর ছেড়ে এখানে কেন এসেছ?'

'আজ থেকে তিন বছর আগে আমরা আমাদের বাবার বাড়িতে ইসলাম গ্রহণ করি। কিন্তু আমাদের পরিবার এই সত্য জানতে পেরে হিন্দু ছেলের সাথে আমাদের বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। আমাদের ধর্মমতে মুশরিকদের বিয়ে করা সম্পূর্ণরূপে হারাম বা নিষিদ্ধ। এ কারণে আমরা বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হই। তাছাড়া সেখানে আমাদের ধর্মীয় উপাসনা ও শিক্ষা অর্জনের স্বাধীনতাও ছিল না। আমাদের ওপর নানারকম নিপীড়নও চালানো হতো। সবদিক থেকেই বাড়িতে বসবাস করা আমাদের জন্য অসহ্যকর হয়ে উঠছিল। বাড়ি ছেড়ে চলে আসা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। আমাদের বিশ্বাস, আমরা ঠিক কাজটিই করেছি। আর এখানে আমরা সুখেই আছি।'

তখন সংখ্যালঘুদের সিটি কাউন্সিলর শর্মা গান্ধি বলেন, 'এখন তোমরা তোমাদের বাড়ি চলো। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, তোমরা সেখানে স্বাধীনভাবে ধর্মপালন করতে পারবে। কেউ তোমাদের বাধা দেবে না।'

উত্তরে আমি বললাম, 'আপনি যখন ধর্মের ব্যাপারে আমাদের স্বাধীনতা দিচ্ছেন তখন আমাদের এখানেই থাকতে দিন। আমি আগেই বলেছি, আমরা এখানে অনেক ভালো আছি। আমরা যদি কোনো মেডিকেল কলেজে পড়তাম, তাহলে আমাদের কোনো হোস্টেলে থাকতে হতো না? দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করার জন্য কোনো দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের হোস্টেলে থাকতে আপত্তি কীসের? পূর্ণ মনোযোগের সাথে শিক্ষা অর্জন করে আমলে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য এর চেয়ে উত্তম বিকল্প আর কী হতে পারে?'

আমার প্রশ্নের মুখে মিসেস শর্মা চুপ হয়ে গেলেন।

এ সময় প্রাদেশিক মন্ত্রী সাহেব বললেন, 'মা, যদি তোমরা তোমাদের অভিভাবকদের বাড়িতে যেতে না চাও, তাহলে করাচিতে আরও অনেক প্রতিষ্ঠান আছে। সেখানেও তো থাকতে পারো?'

'কোন কোন প্রতিষ্ঠান আছে? আমি কি সেগুলোর নাম জানতে পারি?'

Scanned with CamScanner

বললেন, 'অবশ্যই জানতে পারো, সেফটি হোম আছে। কিশোর পুনর্বাসনকেন্দ্র আছে। আরও অনেকগুলো নিরাপদ প্রতিষ্ঠান আছে।'

'এগুলো যদি দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হয় এবং সেখানে গিয়ে দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করা সম্ভব হয়, তাহলে শুধু আমাদের কেন, এই মাদরাসার অন্য মেয়েদেরও সাথে নিয়ে চলুন। আমি সমস্ত মেয়েকে অনুরোধ করব। তারাও আমাদের সাথে যাবে।'

শ্রীমতি শর্মা গান্ধি আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, 'বেশি কথা বলো না, মেয়ে। আমি তোমার চেয়ে বেশি পড়াশোনা করেছি। তুমি জানো, আমি দুই-দুই বার পিএইচডি করেছি?'

আমি বললাম, 'তাহলে আপনার কাছে অনুরোধ, আপনি এগুলোকে দ্বীনি প্রতিষ্ঠান প্রমাণ করুন।'

শ্রীমতি গান্ধির মুখে উত্তর নেই। আমি তখন মন্ত্রীজিকে বললাম, 'মন্ত্রীজি, আমি একজন মুসলিম মেয়ে। আপনি আমাকে সেই দৃষ্টিতে দেখুন। বলুন, কোনো মুসলিম কি তার মেয়েকে কোনো হিন্দু ছেলের কাছে বিয়ে দিতে পারে? আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন যে, এটি হারাম। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদের আপনার নিজের মেয়ে মনে করুন। আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আপনারও দায়িত্ব।'

মন্ত্রীজি বললেন, 'অবশ্যই করব। তোমার চিন্তাধারা শুনে আমি অনেক খুশি হয়েছি। অথচ আমাকে জানানো হয়েছিল, তোমাকে এখানে জোর করে নিয়ে আসা হয়েছে। এ জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।'

মিসেস শর্মা গান্ধি তখন বললেন, 'তুমি আরেকবার তোমার বাবা-মায়ের সাথে একাকী কথা বলো।'

'কথা বলার সময় আমাদের পরিচালিকা আপাকে সাথে নিতে চাই। কারণ, আমি এখনো ভয় পাচ্ছি।' এ কথা বলে আমি একাকী যেতে অস্বীকৃতি জানিয়ে দিলাম। আরও বললাম—'সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আমি আবারও আপনাদের এ কথা বলব যে, আমি ও আমার ছোট বোন স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছি। নিজেদের ইচ্ছায় মাদরাসায় এসেছি। আমরা সুস্থ ও প্রাপ্তবয়স্ক। দুআ করি, আল্লাহ যেন অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের বাবা-মাকেও মুসলিম বানিয়ে দেন। পাশাপাশি, শ্রদ্ধেয়া

Scanned with CamScanner

মিসেস শর্মা গান্ধি-সহ অন্য সকল অমুসলিম অতিথিকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। আমাদের মনে রাখা দরকার, এ পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী। আখিরাতের মহাক্ষতি থেকে বাঁচতে হলে আমাদের এ পৃথিবীতে ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে। আসুন, আমরা ইসলাম গ্রহণ করি। মুসলিম হয়ে যাই। সম্মানিত মুসলিম অতিথিদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ, আমরা যেন ইসলামের সরলপথে অবিচল থাকতে পারি, সেই দুআ করবেন। আমি আপনাদের সবার কাছে অগ্রিম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এবং বিনীত অনুরোধ করছি, আজকের পর থেকে এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে আপনারা আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না।'

শ্রীমতি গান্ধি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমাকে অবশ্যই বোরকা খুলে আরেকবার তোমার দিদির সাথে দেখা করতে হবে।'

'ঠিক আছে। আপনারা মহিলা মাদরাসায় চলুন। সেখানে তাদের সাথে দেখা ও সান্ত্বনা—দুটোই হয়ে যাবে। সেই সাথে আমরা কেমন পরিবেশে থাকি, সেটাও আপনারা দেখতে পারবেন।'

আমি তখন শর্মা গান্ধি ও দুই দিদিকে সাথে নিয়ে আমাদের মহিলা হোস্টেলে এলাম। আমাদের বসবাসের রুম কেমন সেটাও তারা দেখল। আমাদের রুমে এয়ারকন্ডিশনের ব্যবস্থা ছিল। মাদরাসার সুব্যবস্থাপনা দেখে তাদের বিস্ময়ের ঘোর কাটছিল না। অবশ্য সেটা তারা বাইরে প্রকাশ করেননি। হোস্টেলের সমস্ত মেয়ে তাদের স্বাগত জানাল। সালাম জানিয়ে চা-নাস্তাও নিয়ে এলো। হোস্টেলের নিরাপত্তাব্যবস্থা ও বসবাসের এত রকম আধুনিক সুযোগ-সুবিধা দেখে তারা আশ্বস্ত হলেন। তারপরও বিদায়ের সময় আগের বুলিটা বলতে ভুললেন না—'আমাদের সাথে চলো।'

মহিলা হোস্টেলের গেইটে বাবা ও ভাইদের সাথে বোরকা ছাড়াই দেখা করলাম। বাবা আমাদের দেখে বললেন, 'এখন তোমাদের আমার নিজের মেয়ে মনে হচ্ছে। চলো, ঘরে ফিরে যাই।'

'বাবা, 'ঘরে চলো'—এই কথাটা ছাড়া বলার মতো কি আর কোনো কথা নেই? আমাদের অনুভূতিগুলো কি তুমি বুঝতে পারো না? রক্তের সম্পর্কের দোহাই, তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও। আমরা তোমাকে ভালোবাসি। মা, বড়দিদি, মেজো দিদি, বড় ভাইয়া, মেজো ভাইয়া—এদেরও ভালোবাসি। খুব ভালোবাসি। আমরাও তোমাদের কথা মনে করে কষ্ট পাই। কিন্তু বাবা, আমাদের কাছে আমাদের রবের

Scanned with CamScanner

ভালোবাসা রক্তের সম্পর্কের চেয়েও বেশি দৃঢ়, বেশি শক্তিশালী, বেশি গভীর মনে হয়। তুমিহীন জীবনেও তিনি আমাদের সুখে রেখেছেন। কোনো কিছুর অভাব আমাদের বুঝতে দিচ্ছেন না। তোমাদের পরিবেশে তো মেয়েদের উপভোগের বস্তু মনে করা হয়। কিন্তু এখানে কেউ আমাদের আঙুল পর্যন্ত দেখতে পায় না।'

আমার কথা শুনে বাবা নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। কিন্তু শর্মা গান্ধির প্রলাপ বন্ধ হচ্ছিল না। তিনি আমাকে বললেন, 'শুনে নাও মনিকা, এপ্রিল মাসে হাইকোর্টে শুনানি হবে। সেখানে কিন্তু তুমি আমাদের পক্ষে বলবে। নয়তো তোমার কপালে দুঃখ আছে। আমাদের কথা না শুনলে কীভাবে তোমাকে লাঞ্ছিত করি, দেখবে তখন!'

আমিও চুপ করে থাকলাম না, 'আমাকে লাঞ্ছিত করার শক্তি কি আপনার আছে? ভুলে যাবেন না, মানুষকে সম্মান ও অসম্মান করার ক্ষমতা ও অধিকার একমাত্র আল্লাহর।'

আমার উত্তর শুনে শর্মা গান্ধি গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন।

পরদিনের কথা। সাধারণত দুপুর সাড়ে বারোটায় আমাদের হিফয বিভাগে দুপুরের খাবারের জন্য বিরতি দেওয়া হয়। আমরা এ সময় খাবার খেয়ে বিশ্রাম নিই। প্রতিদিনের মতো সেদিনও ক্লাসরুম থেকে বেডরুমের দিকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটি ছোট্ট মেয়ে দৌঁড়ে এসে বলল, 'আপু, আপনাকে পরিচালিকা আপা ডাকছেন। তাড়াতাড়ি আসুন। আপনার ফোন এসেছে।'

তখন ফোনের নাম শুনলেই আমার বুকের ভেতর ধক করে উঠত। মেয়েটির মুখে ফোনের কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলাম। আল্লাহ জানেন, কে আবার ফোন করল! আমি দ্রুত পরিচালিকা আপার রুমে গেলাম। আমাকে দেখে পরিচালিকা আপা বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার ফোন এসেছিল। মুফতি সাহেব কল করেছিলেন। একটু পরেই আবার কল দেবেন। তুমি এখানে বসে অপেক্ষা করো।'

মুফতি সাহেবের নাম শুনে চমকে উঠলাম। কেউ আবার আমার নামে নালিশ করেনি তো? হে আল্লাহ, তার কাছে আমার মান রেখো। দুর্ভাবনাগ্রস্ত মনে আমি আল্লাহর কাছে দুআ করছিলাম। ততক্ষণে ফোন আবার বেজে উঠল। আমি রিসিভার কানে তুলে বললাম, 'আস সালামু আলাইকুম।'

ওপাশ থেকে মুফতি সাহেবের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'ওয়া লাইকুমুস সালাম।

Scanned with CamScanner

আয়িশা মা বলছ?'

'জি।'

ফোনের ওপাশে মুফতি সাহেব উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, 'মুবারকবাদ। কাল তোমার কথাগুলো আমাকে অনেক খুশি করেছে। আল্লাহ তোমাকে নেক হায়াত দান করুন। শুধু আমি নই মাদরাসার সকল শিক্ষিকা তোমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সবাই তোমার প্রশংসা করেছেন। মাদরাসার কোনো মেয়ে আজ-অবধি তোমার মতো এত দৃঢ়তা দেখাতে পারেনি। তোমার ওপর আল্লাহর বিশেষ রহমত রয়েছে। আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাতেই ফোন করেছি। তোমাকে নিয়ে আমার গর্ব হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আগামীতে তোমার মুখ আরও উজ্জ্বল করুন। সবাইকে তোমার মতো নেক সন্তান দান করুন। এবার রাখি, মা। আল্লাহ হাফিয। আল্লাহ তোমাকে সবসময় নিরাপদে রাখুন। আমিন।'

মুফতি সাহেবের মুখে প্রশংসা শুনে আমি বেশ চমকিত হলাম। কী বলব, বুঝতে পারছিলাম না। মনে মনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছিলাম। কাল যা যা বলেছি সবই আল্লাহ আমার মতো নগণ্য বান্দির মুখ থেকে বলিয়ে নিয়েছেন।

আমাদের বিশেষ জামাতের এক মেয়ে আমার পাশেই বসেছিল। ও বলল, 'আয়িশা, যাও। সিজদাতুশ শোকর আদায় করে নাও।'

মেয়েটির পরামর্শ ভালো লাগল। কেন আমি দশ-বিশ সেকেন্ড দেরি করলাম? আমার তো রিসিভার রেখেই সিজদায় লুটিয়ে পড়া দরকার ছিল। এমন অভাবিত প্রাপ্তি কি আর সবার ভাগ্যে জোটে?

আদালত প্রাঙ্গণে

আজ আদালতে আমাদের মামলার শেষ শুনানি হবে। দুপুর বারোটায় আমরা সেখানে পৌঁছে গেলাম। সকাল থেকেই প্রচণ্ড অস্থিরতার মধ্যে সময় কাটছিল। হাত-পা যেন অবশ হয়ে গেছে। চলার কোনো শক্তিই পাচ্ছিলাম না। এক অজানা ভয় ও বিচ্ছেদের আশঙ্কা আমাকে সারাক্ষণ কুরে কুরে খাচ্ছিল। মাদরাসা থেকে চলে যাওয়ার কষ্ট আমার কাছে নিজের বাবা-মা আর ভাই-বোনদের ছেড়ে চলে যাওয়ার চেয়েও বেশি। মনে মনে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছিলাম। শুধু আমি নই,

Scanned with CamScanner

মাদরাসার অন্য মেয়েরা দুরুদুরু বুকে দুআ-দরুদ পড়ছিল। তাদের ভালোবাসা ও সৌহার্দ দেখে আমার দু-চোখ ভিজে গেল। বারবার ভয় হচ্ছিল, এই শেষ ধাপে এসে যদি আমি নিজের কাছে হেরে যাই? যদি আমার মন দুর্বল হয়ে পড়ে? হে আল্লাহ, আমি যেন আবার কুফরে ফিরে না যাই। আমার অন্তরকে দৃঢ় করে দিন। ভয় দূর করে দিন। মনে শক্তি দিন।

মারইয়াম তো এমনিতেই দুর্বল মনের মেয়ে। প্রায়ই বাসার লোকজনের কথা মনে করে কেঁদেকেটে একাকার করে ফেলে। তাদের কথা মনে করে আমিও কাঁদতাম। তবে আমি কাঁদতাম আড়ালে। মারইয়ামের কাছ থেকে লুকিয়ে। আজ মারইয়ামকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'বোন আমার, বিচ্ছেদের এই দিনগুলো একটু ঠোঁট কামড়ে সহ্য কর। ইন শা আল্লাহ, একদিন আমাদের সাথে বাবা, মা, দিদি, ভাইয়া—সবার দেখা হবে। আল্লাহর কাছে নিরাশ হওয়া যাবে না। তিনি আমাদের ব্যাপারে সবকিছু জানেন। দেখিস, একদিন আমাদের পুরো পরিবার ইসলামের ছায়াতলে চলে আসবে। এমন আনন্দের দিন মহান আল্লাহ আমাদের জীবদ্দশায়ই দেখাবেন, ইন শা আল্লাহ। আমরা যদি সেই খুশির মুহূর্ত নাও দেখি, তবু মনে রাখিস, আমরা যে প্রদীপ জ্বালিয়েছি, তার আলো আমাদের ঘর হয়ে অনেক দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়বে। আজ হয়তো আমরা আদালতে যাচ্ছি বিচ্ছিন্ন হতে। কিন্তু এই বিচ্ছেদ, চিরকালের মিলনের জন্য। এতে অপ্রাপ্তির চেয়ে প্রাপ্তি ঢের বেশি।

আমার কেন যেন তখন মনে হচ্ছিল, শিগগিরই আমরা আমাদের রবের পক্ষ থেকে কোনো সুসংবাদ পেতে চলেছি। তবে কী হবে সেই সুসংবাদ, তা শুধু তিনিই জানেন। মারইয়ামকে সান্ত্বনা দিয়ে আমি কুরআনুল কারিম খুলে বসলাম তিলাওয়াতের জন্য। এরপর ঠিক সাড়ে এগারোটার সময় আমরা আদালতের উদ্দেশে রওনা দিলাম। আমাদের সাথে ছিলেন মাদরাসার একজন পুরুষ পরিচালক ও একজন মহিলা পরিচালক। আগে-পিছে পুলিশের চারটি দল আমাদের নিরাপত্তা দিয়ে নিয়ে গেল। আমি তখন বিভিন্ন যিকির, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য দরুদ ও সালাম পাঠ করছিলাম। মারইয়ামও কুরআনুল কারিমের বিভিন্ন আয়াত তিলাওয়াত করছিল। পরিচালিকা আপা ও নাজিম সাহেবও তাসবিহ পাঠ করছিলেন। রাস্তায় রেড সিগন্যালের কারণে আমাদের গাড়িটি হঠাৎ থেমে গেল। তখন শুনতে পেলাম, পাশের একটি হোটেলে কাওয়ালি গান বাজছে—'দর পে বুলা লো মাক্কি-মাদানি... পাস বুলা লো মাক্কি-মাদানি...'

Scanned with CamScanner

গানের কথাগুলো আমার পুরো শরীরে অদ্ভুত শিহরন বইয়ে দিল। মনে হলো, আমার পুরো শরীরে বিদ্যুৎ খেলা করছে। মারইয়ামকে বললাম, 'এই মামলার ফাঁস গলা থেকে নামলেই আমরা উমরা করতে যাব, ইন শা আল্লাহ। আমার মন বলছে, পঙ্কিলতামুক্ত প্রতিটি ইচ্ছা আল্লাহ অবশ্যই পূরণ করবেন। আল্লাহ আমাদের নিজের দিকে ডাকবেন আর আমরা কুফরির দিকে ছুটব! এটা কখনোই হতে পারে না।'

দুপুর বারোটায় আমরা উচ্চ আদালতে পা রাখলাম। বাবা-মা, ভাইয়া, বোন, দুলাভাই আর তাদের উকিল মিস নুরনাজ আগা আগে থেকেই সেখানে ছিলেন। আমাদের পক্ষে আইনি লড়াইয়ের জন্য নিয়োজিত রয়েছেন ব্যারিস্টার মানসুরুল আরিফিন। অত্যন্ত ভদ্র ও সৎ একজন উকিল তিনি। উচ্চ আদালতে বেশ সুনামের সাথে দীর্ঘদিন ধরে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। তিনি যেভাবে আমাদের সহায়তা করেছেন, আমরা নিছক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তার প্রাপ্য আদায় করতে পারব না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অশেষ দয়ায় আইনি লড়াইয়ে আমরা তাকে পাশে পেয়েছি। নইলে এত বড়, এত বিখ্যাত একজন উকিলকে নিয়োগ দেওয়ার সামর্থ্য আমাদের ছিলই না।

সম্মানিত বিচারপতি জনাব গুলজার আহমাদ ও জনাব মালিক এম আকিলের অনুমতিতে আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে মহিলা উকিল কথা বলা শুরু করেন। তিনি বলেন, 'এই কিশোরীদের অপহরণ করা হয়েছে। জোর করে মাদরাসায় আটকে রাখা হয়েছে তাদের। সেখানে তাদের সাথে অভিভাবকদের সাক্ষাৎ পর্যন্ত করতে দেওয়া হচ্ছে না। এমন পরিবেশে রাখা হচ্ছে যে, মেয়েরা ভয় পেয়ে গেছে। কাজেই তাদের সেইফ হোম বা শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্রে পাঠানো হোক—যেন তারা সেখানে তাদের বাবা-মার সাথে দেখা করতে পারে। কথা বলতে পারে।'

উকিল সাহেবার কথাগুলো আমার কাছে অসহ্য লাগছিল। আমি সাথে সাথে দাঁড়িয়ে বললাম, 'সম্মানিত জজ সাহেব, উকিল সাহেবা আমাদের ব্যাপারে অনেক কথা বললেন—যেগুলো ডাহা মিথ্যা কথা। আমাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আমাদেরই জিজ্ঞেস করা হোক।'

জজ সাহেব বললেন, 'সময় হলে অবশ্যই আপনাদের জিজ্ঞেস করা হবে। আপাতত দু-পক্ষের উকিলই কথা বলুক।'

জজ সাহেব বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ পর্যন্ত আপনার মেয়েদের সাথে আপনার দেখা হয়েছে?'

Scanned with CamScanner

বাবা বললেন, 'পাঁচবার হয়েছে। তবে পূর্ণ একাকিত্বে হয়নি। দেখা করার সময় মাদরাসার কোনো-না-কোনো কর্মচারী সাথে থাকত।'

জজ সাহেব বাবাকে ও আমাদের একটি পৃথক কামরায় দেখা করতে পাঠিয়ে দিলেন। বাবার বিষণ্ন মুখ দেখে নিজেকে প্রচণ্ড অসহায় মনে হচ্ছিল। আমি আমার মুখের ওপর নিকাব টেনে রেখেছিলাম—যেন বাবা আমার কান্না দেখতে না পান। উফ! কত কষ্টের ছিল সেই মুহূর্তটি। আল্লাহ যেন এমন পরীক্ষায় কাউকে না ফেলেন। ওই সময়টি আমাদের জন্য কী পরিমাণ কষ্টের ছিল, তা আমি বলে বোঝাতে পারব না। মনে হচ্ছিল, একেকটি মুহূর্ত যেন একেকটি বছর! বাইরে ভাইয়া ও দিদিরা কাঁদছে। দুলাভাই মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে আছে। ছোট ভাই দীপক দেয়ালের দিকে মুখ করে হেঁচকি তুলে কাঁদছে। মারইয়াম ওকে ডাকতেই ও আরও দূরে সরে গেল। আমাদের আদরের ছোট ভাই। কখনো আমাদের কষ্ট দিয়ে কথা বলেনি। ওকে কাঁদতে দেখে হৃদয় ছিঁড়ে যাচ্ছিল। এদিকে মারইয়ামও নিকাবের আড়ালে মুখ লুকিয়ে অঝোরে কাঁদছে। বাবা রুমের ভেতরে প্রবেশ করে বললেন, 'মনিকা, আজ তুই যদি আমাদের ফিরিয়ে দিস, তাহলে আমি নিজেকে গুলি করে মেরে ফেলব।' এ কথা বলে বুকের ওপর হাত রেখে নিসাড় হয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন। আমি বাবার পা জড়িয়ে ধরলাম। বাবার পায়ের সাথে একেবারে মিশে গিয়ে বললাম, 'বাবা, আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমাকে ক্ষমা করে দাও।' এ কথা বলে আমি বাবার পা আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরে তার হাঁটুতে চুমু খেতে লাগলাম। বাবা তখন বেহুঁশের মতো চেয়ারে বসে আছেন। বাবার ঘামে আমি নিজেও ভিজে যাচ্ছিলাম।

অনেক বড় নিঃশ্বাস নিয়ে বুকে সাহস জমিয়ে বললাম, 'বাবা, তুমি একটি বার আমাকে 'আয়িশা' নামে ডাকো। ইন শা আল্লাহ, আয়িশাকে আজীবনের জন্য তোমার পায়ের নিচে পাবে। তোমার অবাধ্য মেয়ে এখন তার রবের বাধ্যতার সুখ পেয়ে গেছে। বলো, আমি কী করব? বাবা, আয়িশার এই শরীর একদিন নিষ্প্রাণ হয়ে মাটির সাথে মিশে যাবে। সেদিন আয়িশার কোনো চিহ্ন থাকবে না। আয়িশা মরে গেলে তুমি কি নতুন আয়িশা পাবে? পাবে না। আয়িশার বিনিময়ে অন্য কিছুও পাবে না। কিন্তু আয়িশা যদি তার রবের আনুগত্যের ওপর মারা যায়, তাহলে কিয়ামতের দিন তার এই ত্যাগের পুরস্কার সে পাবে। বাবা, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। আল্লাহ তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাবেন, যেখানে দুনিয়ার এই লোকজন তোমার কিছুই করতে পারবে না।'

Scanned with CamScanner

আমার বেদনামাখা কথাগুলো বাবা নীরবে শুনলেন। কান্না আটকানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তারপর আমার দিকে তাকালেন। তাকিয়েই রইলেন কিছুক্ষণ, কিন্তু কিছু বললেন না। চোখের দৃষ্টিতে হতাশার ছাপ। বলার মতো কোনো শব্দ পাচ্ছিলেন না হয়তো। কিংবা পেলেও বলতে পারছিলেন না। জন্মের পর থেকে দীর্ঘদিন যে মনিকাকে দেখেছেন, তার সাথে বর্তমানের মনিকাকে মেলানোর বৃথা চেষ্টা চালাচ্ছেন। অবশেষে গলা খাঁকারি দিয়ে কণ্ঠ পরিষ্কার করে বললেন, 'মনিকা, তোকে নিয়ে আমার অনেক গর্ব ছিল। সেই তুই আজ আমার মুখে, গোটা পরিবারের মুখে চুনকালি মেখে দিলি! আজকের পর থেকে তুই আর কখনোই আমাকে দেখতে পাবি না। আমি তোকে ক্ষমা করব না। কীভাবে ক্ষমা করব, বল? তুই আমার মান-সম্মানের কথা ভেবেছিস কখনো? আমাদের পরিবারের কথা একবারও ভেবেছিস? তুই যদি একার ভালোর জন্য নিজের মতো করে সিদ্ধান্ত নিতে পারিস, তাহলে আমি কেন পারব না? আমিও পারব। দেখবি, এবার আমিও আমার সিদ্ধান্তটা নিয়ে নেব। সামনের দিনগুলোতে তোর জীবনে কী ঝড় নেমে আসবে সেটা তুই নিজের চোখেই দেখতে পাবি। দ্বিতীয় জন্মে নয়, এ জন্মেই দেখতে পাবি। এই মোল্লা-মুনশিরা তিন-চারটা করে বিয়ে করে। তুইও একদিন তাদের হাতের পুতুলে হয়ে যাবি। তারা কীভাবে তোর ভালো ব্যবস্থা করবে? কোথায় আশ্রয় দেবে? তোর পেছনে বাবার বাড়ির শক্তি থাকবে না। পরিবার থাকবে না। কোথায় তুই জন্ম নিয়েছিলি? এখন কোথায় চলে এলি? আগামীতে কোথায় যাবি? এ বিষয়গুলো কখনো ভেবেছিস? চিন্তা-ভাবনা না করেই এত বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলি! নিজের বাবার মান-সম্মান মাটির সাথে মিশিয়ে দিলি! শুধু নিজের জীবন নয়, নিজের ছোট বোনের জীবনটাকেও ধ্বংস করে দিলি। ও এখন তোর সুরে সুর মেলাচ্ছে। কখনো কি ভেবেছিস, ছোট বোনটি কোথায় আশ্রয় নেবে? তোরা কি সারা জীবন এভাবে অন্যের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াবি? মাদরাসার ওই মেয়েরা পড়াশোনা করে একদিন চলে যাবে। তখন কে হবে তোদের যষ্টি? কী হবে তোদের ভবিষ্যৎ? বাকিটা জীবন এই মোল্লা-মুনশিদের আশ্রয়ে থাকবি যাদের ঘরে একাধিক বউ আছে?'

বাবার কথাগুলো শুনে আমি কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলাম। মাথার ভেতর ভনভন করছিল। বুজে আসা চোখের সামনে ধীর ধীরে পুরোনো সেই আলোর রেখা ভেসে উঠতে শুরু করল। আমরা কার উম্মত? তিনি কি আমাদের চাইতেও বেশি বাধা-বিপত্তি মোকাবেলা করেননি? তিনি কি ইসলামের ওপর অবিচল থাকেননি? তিনি কি সঠিক পথের অনুসারী ছিলেন না? এরপরও কি তাকে বাধা দেওয়া হয়নি?

Scanned with CamScanner

তার সঙ্গী ও সহযাত্রীদের প্রতিহত করার চেষ্টা করা হয়নি? তারা কি সেই বাধার সামনে মাথা নত করেছিলেন? নাহ! তারা ঈমান ও দ্বীনের প্রশ্নে বিন্দুমাত্রও ছাড় দেননি। এক ইঞ্চি অবস্থানও ত্যাগ করেননি। তাদের কথা আমাকে জেগে ওঠার প্রেরণা জোগাল। আমি ভুলে গেলাম, কার সামনে বসে আছি।

অমিত সাহস ও বিনয়ের সাথে বললাম, 'বাবা, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আয়িশা মাটির তৈরি ক্ষণস্থায়ী মেয়ে। তোমার চোখের সামনে, এখন এই মুহূর্তে সে মরে যেতে পারে। সে আরেকটু নিঃশ্বাস নিতে পারবে, এমন নিশ্চয়তা কেউ তাকে দিতে পারবে না। তোমার মেয়ে যদি তোমার চোখের সামনে মারা যায়, তুমি কি বাকি জীবন তাকে দেখতে পাবে? দ্বিতীয় জন্ম একটা মিথ্যা বুলি। পুনর্জন্ম বলে আসলে কোনো কিছুই নেই। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের পর আমাদের আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনে চলে যেতে হবে। তুমি আর মা মিলে আমাকে লালনপালন করেছ। কিন্তু তুমি তো মা-বাবার লালনপালন ছাড়াই বেড়ে উঠেছ। তখন কি তুমি ভেবেছিলে, একসময় তুমি এই স্তরে আসবে? সে সময় কে তোমাকে আগলে রেখেছে? তুমি কি বলতে পারবে, আগামীতে তোমার ভাগ্যে কী আছে? পৃথিবীতে মানুষ তার কর্ম, নিয়ত ও ঈমান অনুসারে প্রতিদান পেয়ে থাকে। এ কারণেই একজন চোর একজন বিশ্বস্ত মানুষের সমান প্রতিদান পায় না। আমি ওই মোল্লা-মুনশিদের জন্য ইসলাম গ্রহণ করিনি। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি। পৃথিবীর এই জীবনে বাবা-মা আছে; কিন্তু মৃত্যুপরবর্তী জীবনে বাবা-মায়ের বন্ধন থাকবে না। তুমি নিজেও তো আত্মার কথা স্বীকার করো। বলো, সেই আত্মাগুলোকে কে বাঁচিয়ে রেখেছে?'

বাবা কিছুক্ষণ আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন। কোনো কথা বললেন না। এরপর চেয়ার ছেড়ে উঠে সালিশ ঘরের দিকে হাঁটা শুরু করলেন। তার পিছনে পিছনে আমিও বেরিয়ে এলাম। যতক্ষণ বাইরে ছিলাম, সারাক্ষণই সুরা তিলাওয়াত করেছি। কখনো বাবার ওপর, আবার কখনো মারইয়ামের ওপর ফুঁ দিয়েছি। আমার ভয় হচ্ছিল, না-জানি মারইয়াম দুর্বল হয়ে পড়ে। ওকে নিয়ে তখন আমি খুব চিন্তায় ছিলাম।

জজ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার আপনার বক্তব্য বলুন।'

বাবা জবাব দিলেন, 'আমি আমার সর্বশক্তি ব্যয় করে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার মেয়ে এখন আর আমার হাতে নেই। তার ইচ্ছার কাছে এখন আমরা অসহায়।'

Scanned with CamScanner

জজ সাহেব তখন আমার দিকে তাকালেন। তিনি আমার পরিচয়পত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র চাইলেন। কী আশ্চর্য, ভুল করে আমি সেগুলো মাদরাসায় রেখে এসেছিলাম। জজ সাহেব তখন রাগ হয়ে বললেন, 'কী অবাক কাণ্ড! শুনানিতে এলেন, কাগজপত্র আনলেন না? এ কেমন কথা?'

জজ সাহেব টেবিলের ওপর কলম ফেলে দিলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে আমার কান্না থেমে গেল। বুঝতে পারছিলাম না, কী করব। এমন সময় নাজিম সাহেব ঘরের বাইরে গেলেন। আমাদের অবাক করে দিয়ে ঘরে ঢুকলেন কাগজপত্র নিয়ে। আল-হামদু লিল্লাহ, মাদরাসার লোকজন কিছুক্ষণ আগেই সেগুলো পাঠিয়েছে।

জজ সাহেব সেগুলো দেখে নিয়ে আমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করলেন। আমি শান্তভাবে প্রশ্নের উত্তর দিলাম। এ সময় তিনি আমার বাবা-মা সম্পর্কেও কিছু প্রশ্ন করলেন এবং শেষে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন আপনাদের ব্যয়ভার কে বহন করবে?'

আমি বললাম, 'আমাদের সকল ব্যয়ভার মাদরাসা বহন করছে। আমরা সেখানেই থাকতে চাই। কারণ সেখানে থেকে আমাদের পক্ষে দ্বীনি ইলম অর্জন করা সহজ হবে। এর বাইরে আমাদের সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য জজ সাহেব জেনে নিলেন উকিল সাহেবের মাধ্যমে। জজ সাহেব আমাদের পক্ষে রায় দিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত আমাদের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিলেন।

রায় শুনে আমাদের পরিবারের সবাই কাঁদতে শুরু করল। বাবার চোখ থেকেও টপটপ করে পানি পড়ছে। ছোট ভাই দীপক তো হুহু করে কাঁদতে শুরু করল। আমি ওর কান্না থামাতে ওর দিকে ছুটে গেলাম। ও আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আরেকটু দূরে গিয়ে বসে পড়ল। প্রচণ্ড কষ্টে আমি দাঁড়িয়েই কাঁদতে লাগলাম। ভাইয়া ও দিদিরা-সহ সব আত্মীয়-স্বজন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কাঁদতে কাঁদতে আমি আর মারইয়াম তাদের চলে যাওয়া দেখছিলাম। ওই সময় আমরা কতটা ভেঙে পড়েছিলাম, সেটা বলে বোঝাতে পারব না। ধৈর্যের সবগুলো বাঁধ ভেঙে পড়ছিল। একবার মারইয়ামকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছি, তো আবার পরিচালিকা আপাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছি। আমাদের উকিল ব্যারিস্টার সাহেবের চোখ থেকেও অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তিনি বয়স্ক মানুষ। আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। জড়তা মেশানো কণ্ঠে বললেন, 'মা, আল্লাহ আজ তোমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। তোমাদের কবুল করেছেন। মুবারকবাদ। আমার জন্য এবং আমার পরিবারের জন্য দুআ করবে।' কথাগুলো বলে পকেট থেকে রুমাল বের

Scanned with CamScanner

করে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেলেন উকিল সাহেব।

আমরা বিধ্বস্ত দেহে, কোনোমতে পা টেনে টেনে বাইরে বেরিয়ে এলাম। পরিচালিকা আপা আমাদের ধরে গাড়ি পর্যন্ত নিয়ে এলেন। চুপচাপ গাড়িতে বসে পড়লাম। আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন সিকিউরিটির বয়স্ক অফিসার। অভিনন্দন জানালেন। নিজের জন্য দুআ চাইলেন। আমরা শুধু শুনলাম। আমাদের মুখে কোনো কথা আসছে না। আজ জিতেও নিজেদের পরাজিত মনে হচ্ছে। কোনো সন্তানের পক্ষে কি নিজের বাবা-মায়ের পরাজয় মেনে নেওয়া সম্ভব?

আমাদের গাড়ি যখন মাদরাসায় প্রবেশ করল, দেখতে পেলাম মুফতি সাহেব-সহ পুরো মাদরাসা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। পরিচালিকা আপা, অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষী বোন, শিক্ষিকা এবং মাদরাসার সকল ছাত্রী অধীর হয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। গাড়ি থেকে নামার পর তারা আমাদের জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করলেন। আদর, সোহাগ ও স্নেহ জানাতে লাগলেন হৃদয় উজাড় করে। কেউ মুখে খাবার তুলে দিচ্ছেন, কেউ-বা আবার পানি পান করাচ্ছেন। তারা আমাদের জন্য এতটা অস্থির ছিলেন যে, এত বেলা হওয়া সত্ত্বেও পুরো মাদরাসার একটি মানুষও খাবার খাননি। তারা আমাদের জন্য ব্যাকুল চিত্তে অনবরত দুআ-দরুদ পাঠ করছিলেন।

আবারও ঝঞ্ঝাট

আমাদের পেয়ে মাদরাসার সকল ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা সবাই খুব খুশি হয়েছিল। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, সবাই ঈদ উদযাপন করছে। ছাত্রীরা সময় পেলেই আমাদের কাছে আমাদের আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নিত। সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করত। দিনগুলো এভাবেই কেটে যাচ্ছিল।

আমরা ভেবেছিলাম, সেদিনের পর পরিবারের লোকজন আমাদের সাথে সম্পর্ক পুরোপুরি ভেঙে ফেলবে। আমাদের ভুলে যাবে। তারা বোধহয় আর কখনোই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে না। কিন্তু আমাদের অবাক করে দিয়ে মাত্র এক সপ্তাহের মাথায় বাড়ি থেকে ফোন এলো। ফোন করেছিলেন বড়দিদি। রিসিভারের এপাশে আমাকে পেয়ে বললেন, 'মনিকা, কেমন আছিস? আমি তোর কমলা দিদি বলছি।'

'দিদি, কেমন আছ তুমি? বাচ্চারা সবাই ভালো আছে?'

Scanned with CamScanner

'হ্যাঁ, সবাই তোকে মিস করছে।' কান্না জড়ানো কণ্ঠে বললেন, 'বাবা তোর কথা খুব বেশি বলে। তোরা ভালো আছিস তো? আর শোন, লক্ষ্মী ওর স্বামীর সাথে ইন্ডিয়া চলে যাচ্ছে।'

'লক্ষ্মী দিদিকে বোলো, যাওয়ার আগে যেন আমার সাথে দেখা করে যায়।'

কমলা দিদি নাকচ করে দিয়ে বললেন, 'না, এখন আর সেটা হবে না। ওর শাশুড়ি ওকে শক্ত ভাষায় নিষেধ করে দিয়েছেন। বলেছেন, এখন আর মাদরাসায় গিয়ে কী লাভ? এরপরও যদি তোমরা সেখানে যাও, তাহলে এর মানে দাঁড়াবে, তোমার বোনদের কুকর্মের সাথে তোমরাও জড়িত।'

আমি বললাম, 'দিদি, তুমি তো আসতে পারো।'

'মনিকা, বাবা বলছেন, ওদের বলে দাও—ওরা যেন পড়াশোনা শেষ করে বাসায় ফিরে আসে। সেখানে কাউকে যেন বিয়ে না করে। জানি না, ওরা তোমাদের দুজনকে কোথায় ছুড়ে ফেলবে?'

আমি মৃদু হাসির সাথে বললাম, 'দিদি, তোমরা তো এসে আমাদের থাকার জায়গা দেখেই গিয়েছ। তোমরা নিজেরাই স্বীকার করেছিলে, থাকার জায়গায় কোনো সমস্যা নেই। সবকিছু যথেষ্ট ভালো। তাই এখন আমাদের বিয়ে-শাদি নিয়েও চিন্তা করার দরকার নেই। আমি দুআ করি, আল্লাহ তোমাদের হিদায়াত দান করুন।'

এরপর বেশ কদিন নিশ্চিন্তে ছিলাম। এখন আর আমাদের কোনো পিছুটান নেই। ব্যস্ততার ঝঞ্ঝাটও নেই। মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করছি। আমাদের কায়দা সম্পন্ন হয়ে গেছে। কুরআনুল কারিমের ত্রিশতম পারা মুখস্থ করা শুরু করেছি। সেই সাথে অর্থসহ চল্লিশ হাদিসও মুখস্থ হয়ে গেছে। আল-হামদু লিল্লাহ, কুরআনুল কারিম থেকে চল্লিশটি দুআও মুখস্থ করেছি। তাহাজ্জুদের অভ্যাস গড়ে উঠেছে। তাহাজ্জুদের সময় হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চোখের পাতা খুলে যায়। এ জন্য সবাইকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগানোর দায়িত্ব আমার ওপরই পড়েছে। প্রায় সময় আত্মীয়-স্বজনকে স্বপ্নে দেখি। কখনো দেখি, তাদের দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছি। আবার কখনো দেখি, তাদের ঘরে গিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার এই স্বপ্ন আল্লাহ অবশ্যই পূরণ করবেন। তবে কবে করবেন, তা আমি জানি না। আল্লাহ ভালো জানেন। আল্লাহ আমাকে ধৈর্য দিয়েছেন। তাই এখন আর আমি কোনো প্রসঙ্গেই

Scanned with CamScanner

'কেন' কিংবা 'কখন' বলি না। ধৈর্যের সাথে আল্লাহর সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করি।

হুট করে ঠিক দু-সপ্তাহের মাথায় আবার কমলা দিদির ফোন পেলাম। 'মনিকা, কেমন আছ? নীলম কোথায়?'

'আমি ভালো আছি। এই নাও, মারইয়ামের সাথে কথা বলো।'

মারইয়াম রিসিভার কানে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দিদি, কেমন আছ?'

'হ্যাঁ, আমি ভালো আছি। নীলম, বাবা বলছেন, মনিকা যেন তোকে বিয়ে না দেয়। সুযোগ বুঝে ওখান থেকে পালিয়ে অন্য কোথাও চলে যাস। আমরা তোকে সব রকমের সাহায্য করব।'

দিদির কথা শুনে মারইয়াম বলল, 'আমাদের তো এখানে কোনো কষ্ট হচ্ছে না। এখানে থাকতে দিতে তোমাদের এত আপত্তি কেন? তুমি আর বাবা কেন বারবার জিদ করছ? কেন এখান থেকে পালিয়ে যেতে বলছ?'

'না, আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু বাবা আসলেই অনেক জিদ দেখাচ্ছেন। তিনি বলছেন, আমি আজীবন ওদের মাদরাসা থেকে বের করার চেষ্টা করে যাব। ওদের বলে দাও, ওরা যেন ওখানকার কাউকে বিয়ে না করে।'

মারইয়াম দৃঢ়তার সাথে বলল, 'দিদি, আমরা এখানে বিয়ে করতে আসিনি। আর এই মাদরাসা আমাদের কোনো আত্মীয়ের বাড়িও নয়। বাবাকে বলে দিয়ো, তিনি যেন কোনো ধরনের দুশ্চিন্তা না করেন। এখানে কেউ এসব বিষয়ে কথা বলে না। কিন্তু তোমরাই বারবার এসব কথা বলে ডিস্টার্ব করছ। এবার রাখি, দিদি। আল্লাহ হাফিয।'

সেদিন কথার মাঝখানে ফোন রেখে দিলেও ঝামেলা একেবারে শেষ হলো না। বাবা আর দিদিরা বিয়েশাদি নিয়ে বারবার আমাদের চিন্তা বাড়াতে লাগলেন। তাদের বোঝাতে পারলাম না যে, বিয়েশাদির জন্য বাড়ি ছাড়িনি আমরা। বাড়ি ছেড়েছি শুধু মহান আল্লাহর ইবাদত ও দ্বীনচর্চার জন্য। বিয়েশাদি গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত হলেও এই মুহূর্তে আমরা সেটা নিয়ে ভাবছি না। কারণ, বিয়ের ফলে আমাদের বাবা-মা ও আত্মীয়-স্বজনের মাঝে কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে, তা আমরা জানতাম। কিন্তু তাদের বাড়াবাড়ি ও পীড়াপীড়ি সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। আর কোনো উপায় না দেখে মাদরাসার হিতাকাঙ্ক্ষীদের কাছে আমাদের পরিবারের লোকজনের

Scanned with CamScanner

মনোভাব ও আমাদের মনোভাবের কথা জানাতে বাধ্য হলাম। আমরা ভাবছিলাম, এখন পর্যন্ত তারাই আমাদের সবগুলো সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে দিয়েছেন। এ সমস্যার সমাধানও তারাই করতে পারবেন। আমরা যদি বিষয়টি তাদের না জানাই, তাহলে তো তারা কোনো প্রকার সহযোগিতাও করতে পারবেন না।

ব্যাপারটি জানানোর সাথে সাথে মুফতি নাইম সাহেব ও আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীরা পরামর্শ করতে বসে গেলেন। মিরপুরখাসের শাইখ হাফিজুর রহমানকেও মুফতি সাহেব ফোন করলেন। সালাম বিনিময় ও কুশল জিজ্ঞাসার পর বললেন, 'হাফিজ সাহেব, আল-হামদু লিল্লাহ, আপনার দু-বোন ভালোই আছে। তবে নতুন একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাদের বাবা-মা ও আত্মীয়-স্বজন তাদের পেছনে লেগেই আছে। কিছুতেই ছাড়ছে না। আপনি তো জানেনই, তারা এত দিন একের পর এক সমস্যা সৃষ্টি করেই গেছে। আল-হামদু লিল্লাহ, তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। এখন শুনছি, তারা বিষয়টি গভর্নর সাহেবের কাছে টেনে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে। এদিকে মেয়েদের বারবার ফোন করে বিয়েশাদির বুলি আওড়ে যাচ্ছে। বিষয়গুলো নিয়ে ওরা খুবই চিন্তায় আছে।'

'আমার কানেও কথাগুলো এসেছে, মুফতি সাহেব। আপনার কাছে রেখে এসে, ওদের নিরাপত্তার ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওদের বাড়ির লোকেরা যা শুরু করল! দুশ্চিন্তা তো কাটছেই না। আমরা এখানে নানারকম চেষ্টা করে যাচ্ছি। আশা করছি, দ্রুত আপনাকে ভালো কোনো খবর শোনাতে পারব। ইন শা আল্লাহ, এক সপ্তাহের মধ্যে আবার আপনার সাথে কথা হবে।'

অবশেষে

শাইখ হাফিজুর রহমান সাহেব তার কথা রেখেছেন। তিনি সবসময় বড় ভাইয়ের মতো আমাদের মাথার ওপর ছায়া হিসেবে ছিলেন। আমাদের নিরাপদে রাখার জন্য তিনি সব রকমের চেষ্টা করে গেছেন। সেদিন মুফতি সাহেবের সাথে কথা বলার সময় তিনি শীঘ্রই একটি সুসংবাদ দিতে চেয়েছিলেন। কথামতো এক সপ্তাহের মাথায় তিনি আবার মুফতি সাহেবকে কল দিলেন। পরদিন একজন জানাল, মুফতি সাহেবের স্ত্রী আমাদের অফিসরুমে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমরা গেলাম। আন্টি বললেন, 'মা আয়িশা, মা মারইয়াম, কেমন আছ তোমরা? পড়াশোনা কেমন চলছে? কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো?'

Scanned with CamScanner

'না আন্টি, কোনো সমস্যা হচ্ছে না, আল-হামদু লিল্লাহ। সবকিছু ঠিকঠাকই চলছে। তবে...' এতটুকু বলেই আমি থেমে গেলাম।

'তবে কী? খুলে বলো আমাকে। আমি তোমাদের মায়ের মতো। সংকোচ কোরো না। মায়ের কাছে কীসের সংকোচ?'

আমি তখন মারইয়ামকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'তুই আন্টিকে বল, কাল কী হয়েছিল।'

মারইয়াম বলল, 'আন্টি, বাসার লোকজন আবার আমাদের বিরক্ত করছে। হুমকি দিচ্ছে, আমাদের বিষয়টি গভর্নরের কাছে তুলবে। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে আমাদের মাদরাসার ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। রাষ্ট্রপতির কাছেও যাবে। কাল বাবা নিজেই ফোন করেছিলেন। বললেন, এসব মোল্লারা কী করতে পারবে? খবরদার, তোমরা বিয়ে করবে না। নয়তো সেখানেও তোমাদের নাজেহাল করে ছাড়ব।

সব শুনে আন্টি বললেন, 'হ্যাঁ, মারইয়াম। এসব কথা আমাদের কানেও এসেছে। এই সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যায়, সেটা নিয়ে তোমরা ভেবেছ?'

'আন্টি, এমন সমস্যায় পড়লে মানুষ অনেক কিছুই ভাবতে বাধ্য হয়। আমরা যখন মিরপুরখাসে ছিলাম, তখনই সেখানকার উলামায়ে কেরাম বিষয়টি নিয়ে ভেবেছিলেন।'

আমার কথা শুনে আন্টি বললেন, 'সমস্যাকে এভাবেই রেখে দিলে চিন্তা আরও বাড়বে। কেউ যদি সমাধানের উদ্যোগ নেয়? কী বলো তোমরা?'

'এতদিন আপনারাই আমাদের সব সমস্যার সমাধান করেছেন। আমাদের পাশে থেকেছেন। এবারও আপনারা যা ভালো মনে করেন সেটাই হবে।'

আন্টি তখন আমাদের হাফিজুর রহমান সাহেবের দেওয়া প্রস্তাবটির কথা জানালেন। অবাক হয়ে আমি আর মারইয়াম একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম। প্রস্তাবটি আমাদের এলাকারই একটি পরিবার থেকে এসেছে। তাদের আমরা একটু আধটু চিনিও।

আন্টি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা তাদের চেনো?'

'আপনি কি প্রেসওয়ালা বাড়িটির কথা বলছেন? তাদের আমরা খুব বেশি চিনি না। তবে এতটুকু জানি, তারা খুবই দ্বীনদার। তাদের বাড়িতে মেয়ে-মানুষ আছে বলে বাইরের লোকের ঢোকার অনুমতি নেই সেখানে। পর্দার ব্যাপারে তারা খুবই

Scanned with CamScanner

সচেতন। মিরপুরখাসের সমস্ত লোক তাদের সম্মান করে। এমনকি হিন্দুরাও তাদের সমীহ করে চলে। আমাদের বাড়ি থেকে সামান্য দূরেই তাদের বাড়ি। তারা অনেক বড়লোক। আমরা অবশ্য কখনো তাদের দেখিনি। তাই এর বেশি কিছু জানি না।'

আমার উত্তর শুনে আন্টি হাসতে শুরু করলেন। বললেন, 'তারা তোমাদের দুজনকেই পুত্রবধূ বানিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন। কিন্তু আমরা ঠিক করেছি, পরীক্ষা করার জন্য প্রথমে একজনকে বিয়ে দেবো। যদি পরীক্ষায় উতরে যায়, তাহলে দ্বিতীয়জনের বিয়ের জন্য দেরি করব না।'

আন্টি আরও বললেন, 'দুই-এক সপ্তাহের মধ্যে তারা হাফিজুর রহমান সাহেবকে সাথে নিয়ে এখানে আসবেন। তুমি যদি রাজি থাকো আর আমরা যদি আশ্বস্ত হই, তাহলে এই প্রস্তাব মঞ্জুর হবে। যেহেতু তারা শুধু তোমার এলাকারই লোক নন, প্রতিবেশীও; তাই তাদের ব্যাপারে তোমরাই আমাদের চেয়ে বেশি জানবে। ভালোই হলো। আল্লাহ তাআলা যে সবসময় তোমাদের দু-বোনের ওপর দয়ার চাদর বিছিয়ে রাখেন, সেটা আরেকবার দেখলাম।

জুমুআর দিনে ছেলে, ছেলের বাবা-মা এবং কয়েকজন আত্মীয় মিরপুরখাস থেকে শাইখ হাফিজুর রহমান সাহেবকে সাথে নিয়ে মাদরাসায় এলেন। মুফতি সাহেব, সকল শিক্ষক-সহ মাদরাসার সবাই উষ্ণ অভ্যর্থনার সাথে তাদের বরণ করে নিলেন। বিদায়ের সময় আমার হিতাকাঙ্ক্ষীরা ছেলেপক্ষকে বললেন, 'আমাদের একটু সময় লাগবে। নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন। বুঝতেই পারছেন, এই বিয়েটা আর দশটা সাধারণ বিয়ের মতো নয়। আমাদের ওপর অনেক দায়িত্ব। কয়েকদিনের মধ্যে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করে আমাদের মতামত জানিয়ে দেবো, ইন শা আল্লাহ। দু-সপ্তাহ পর তারা ছেলেপক্ষের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে দিলেন। পুরো মাদরাসায় আনন্দের হিল্লোল পড়ে গেল বিয়ের সুসংবাদ শুনে। সবাই এসে অভিনন্দন জানাতে লাগল। জানতে চাইল, 'এত ভালো জায়গা থেকে বিয়ের প্রস্তাব এলো কীভাবে? কার মাধ্যমে?'

'বাহ রে! আমি কী করে বলব? সব কাজই তো হাফিজুর রহমান সাহেব করেছেন। তাকেই জিজ্ঞেস করুন। তিনিই ভালো বলতে পারবেন।'

সবাই তখন হাফিজুর রহমান সাহেবকে চেপে ধরলেন। সকলের কৌতূহল দূর করতে হাফিজ সাহেব বললেন—

Scanned with CamScanner

'আমি যখন আয়িশা আর মারইয়ামকে মাদরাসায় রেখে মিরপুরখাস ফিরে যাচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিল বুকের ওপর থেকে একটা ভারী পাথর নেমে গেছে। ওদের একটি নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিতে পেরেছি। কিন্তু পাশাপাশি এটাও মনে হচ্ছিল, এখন থেকে আমি ওদের ভাই। আস্থার সাথে আমাকে তারা আপন ভাইয়ের স্থানে বসিয়েছে। আমাকে তাদের আস্থার মূল্য দিতে হবে। ওদের এখানে রেখে গেলেই আমার দায়িত্ব শেষ হচ্ছে না। ওদের জন্য আরও কিছু করতে হবে।

এসব ভেবে আমি টেনশনে থাকতাম। ওদের আগামী জীবন কীভাবে মসৃণ আর গতিময় করা যায়, তা নিয়েই ভাবতাম দিনরাত। একজন আপন ভাই হিসেবে আমি চিন্তা করতাম, ওদের উপযুক্ত জায়গায় বিয়ে দিতে হবে। তাই ওদের জন্য পাত্র খোঁজার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কিন্তু ওদের দ্বীনদারির স্তরের পাত্র খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ওরা দুজন দ্বীনের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে। যার-তার হাতে আমি ওদের তুলে দিতে পারি না। অবশেষে আল্লাহর রহমতে আয়িশার জন্য একজন উপযুক্ত পাত্র পেয়ে গেলাম। আমার চোখ পড়ল আমার দ্বীনদার বন্ধু জামশেদের ওপর। ও আমার অনেক দিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রতিটি কাজে এই বন্ধু আমার ওপর চোখ বুজে আস্থা রাখত। সমস্যা দাঁড়াল জামশেদের বাবা-মাকে নিয়ে। তাদের কীভাবে ম্যানেজ করব? তারা আমাকে চেনেন, তবে সেটা সালাম ও কুশল বিনিময় পর্যন্তই। আমি তখন আল্লাহর কাছে মন খুলে দুআ করতে লাগলাম। আমার মনে বিশ্বাস জন্মাল, জামশেদের বাবা-মা, বিশেষ করে তার বাবা আমার কথা ফেলতে পারবেন না। অবশেষে বিসমিল্লাহ বলে জামশেদের বাড়িতে হাজির হলাম। মেয়ে-দুটোর আত্মত্যাগের ফিরিস্তি তুলে ধরলাম আংকেল-আন্টির কাছে। তাদের ছেলের বউ করে ঘরে তোলার ব্যাপারেও উৎসাহমূলক কিছু কথা বললাম। আমাকে অবাক করে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন তারা। আংকেল বললেন, যদি জামশেদ রাজি থাকে তাহলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তবে তার আগে আমাদের বাবা-মা, মানে জামশেদের দাদা-দাদীর কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। আমি আজ পর্যন্ত কোনো কাজে আমার বাবা-মায়ের অবাধ্য হইনি। বুড়ো বয়সে এসেও আমি অবাধ্যতার কলঙ্ক গায়ে মাখতে চাই না।

ওদিকে অন্য একটি জায়গায় জামশেদের বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। এরপরও জামশেদ আমার প্রস্তাবের পক্ষে সায় জানিয়ে দিল। আমি তখন আরেকবারের মতো বুঝতে পারলাম, আসলেই এ মেয়ে-দুটোর ওপর আল্লাহর বিশেষ রহমত আছে। সেদিনের পর থেকে আমি অপেক্ষা করছিলাম, কবে জামশেদের বাবার কাছ থেকে

Scanned with CamScanner

সবুজ সংকেত পাব। তার সাথে দ্বিতীয় বার দেখা করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সে সময় আবার তাকে পারিবারিক কাজে পেশোয়ারের গ্রামের বাড়িতে চলে যেতে হয়েছিল। জামশেদের ঘরানা শুরু থেকেই দ্বীনদার। এ জন্য আমি আশাবাদী ছিলাম, ওর দাদা-দাদী নিশ্চয়ই অমত করবেন না। তারা অমত করেওনি। জামশেদের বাবা আমাদের সে কথা জানিয়ে দিলেন। তার মানে, জামশেদের সাথে আয়িশার বিয়ে পাক্কা। আমি সেই সুসংবাদ জানাতে ফোন করলাম মুফতি নাইম সাহেবের কাছে। তার থেকে অনুমতি পেয়ে জামশেদের পরিবারের সবাইকে নিয়ে করাচির জামিয়া বিন্নুরিয়ায় চলে এলাম। মুফতি সাহেবও অত্যন্ত খুশি হলেন দ্বীনদার পরিবারটির সাক্ষাৎ পেয়ে। এত খুশির ভিড়েও আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। কারণ, এখন পর্যন্ত মারইয়ামের নীড় গোছাতে পারিনি আমি। এখন দিনরাত মহান আল্লাহর কাছে দুআ করি যে, আল্লাহ যেন তার জন্যও কল্যাণময় ব্যবস্থা করে দেন।'

স্বামীর বাড়িতে যাওয়ার দুদিন আগে আমি নতুন আরেকটি পরীক্ষার সম্মুখীন হই। এটাও আমার বাবা-মায়ের কাছ থেকেই আসে। তারা সুপ্রিম কোর্টে আমাদের বিরুদ্ধে আরেকটা পিটিশন দাখিল করলেন। সেই পিটিশনের কারণে মুফতি সাহেব চরম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কারণ, এই মুহূর্তে কিছু হয়ে গেলে বিয়ের ওপর খড়্গ নেমে আসবে। কিন্তু এবারও মহান আল্লাহ আমাদের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করলেন। সুপ্রিম কোর্ট সেই পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে মিরপুরখাসের ডিপিও জনাব মুনির আহমাদ শেখের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠান। তিনি তখন মাদরাসা থেকে হাইকোর্টের সবগুলো কেসের কাগজপত্র নিয়ে তার আলোকে রিপোর্ট তৈরি করেন। মুনির আহমাদ সাহেবের ভূমিকা অস্বীকার করলে অনেক বড় অকৃতজ্ঞতা হয়ে যাবে। তিনি আমাদের রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন সম্পূর্ণ সততা ও নিষ্ঠার সাথে। তার এই সততার কারণে আমরা চিন্তামুক্ত হতে পেরেছিলাম।

মুনির আহমাদ শেখ সাহেব ছাড়াও অনেকেই তখন সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। দুর্নীতি-অনৈতিকতার এই সময়ে সততা ও স্বচ্ছতার সাথে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করা অনেক বড় কৃতিত্বের কাজ। মুনির আহমাদ সেই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। সমাজের প্রতিটি মানুষ যদি এভাবে নৈতিকতা ও স্বচ্ছতার সাথে দায়িত্ব পালন করে, তাহলে খুব সহজেই একটি সোনালি সমাজ গড়ে উঠবে।

মুফতি নাইম সাহেব আমার বিয়ের দিন তিনশোরও বেশি মানুষকে দাওয়াত দিলেন। অতিথিরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আমাদের সাথে কথা বলেছেন, খোঁজখবর

Scanned with CamScanner

নিয়েছেন। দুআ করেছেন আমাদের জন্য। মনে হচ্ছিল, আজ বুঝি খোদ মুফতি সাহেবেরই মেয়ের বিয়ে। একটি মেয়ের জীবনে বিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। কোনো মেয়ের যদি বাবা-মা না থাকে, তাহলে সে অন্যসময় তাদের কথা মনে করুক বা না-করুক, অন্তত বিয়ের দিনগুলোতে অবশ্যই মনে করে। কিন্তু তারা আমাদের আদর-সোহাগে এতটাই আচ্ছন্ন করে রাখলেন যে, এক মুহূর্তের জন্যও পরিবারের শূন্যতা অনুভব করার সুযোগ পাইনি। এত এত অতিথি, উপহার-উপঢৌকনের প্রাচুর্য, উষ্ণ অভ্যর্থনা ও আন্তরিকতার জন্য বিয়ের আয়োজনটি কল্পনাতীত প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। আমি আবেগাপ্লুত সবার আন্তরিকতা দেখে। বিয়ের অনুষ্ঠানে আমার শ্রদ্ধেয় উকিল অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মুশতাক আহমাদ মায়মান সাহেব এবং তার পুত্র ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমাদ মায়মান সাহেবও এলেন। তাদের আগমনে অশ্রু সংবরণ করতে পারিনি।

বিদায়ের সময় আন্টিকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদলাম আমি। যেন আন্টিকে নয়, আমার জন্মদাত্রী মাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। এমন স্নেহের নীড় ছেড়ে যেতে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল।

গাড়ির সামনে এসে মুফতি সাহেব বেদনাহত কণ্ঠে বললেন, 'মা, আমি তোমাকে আল্লাহর নিরাপত্তায় তুলে দিচ্ছি। যে পরিবারের হাতে তোমাকে তুলে দিচ্ছি, তারা অত্যন্ত দ্বীনদার। এতদিন আমার কাছে যেমন আদর্শ মেয়ে হয়ে ছিলে, আমার বিশ্বাস, তাদের কাছেও তেমনি আদর্শ স্ত্রী ও বউমা হয়ে থাকবে। তোমার জন্য দুআ রইল। আল্লাহ তোমাকে সুখী করুন।'

আমি দু-হাতে মুখ বুজে কান্না দমিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম। এরই মধ্যে আমাদের বহনকারী গাড়িটি একটি অচেনা পথে বেরিয়ে পড়ে। না না, এ পথ অচেনা নয়। আমার বহুদিনের চেনা একটি পথ। আমার শ্বশুরবাড়িকে সবাই 'ইউজুফ যাই পাঠানদের বাড়ি' হিসেবে চেনে। মিরপুরখাসের প্রতিটি লোক তাদের চেনে। সেই পরিবারের সন্তান জামশেদ খানের সাথে আমার নতুন জীবনের শুরু।

বিয়ের মজলিসে আমি চিন্তা করছিলাম, মহান আল্লাহ আমাকে কত দ্রুত দয়ার চাদরে জড়িয়ে নিয়েছেন। আসলে প্রতিটি কাজেরই একটি নির্দিষ্ট সময় থাকে। প্রতিটি কষ্টই এক সময় দূর হয়ে যায়। বান্দা শুধু এতটুকু জানে, কষ্ট দূর হবে, স্বস্তি আসবে। তবে কখন কষ্ট দূর হবে, তা জানে না। এটা কেবল আল্লাহ জানেন।

Scanned with CamScanner

হয়তো আমার ব্যাপারে আমার বাবা ও ভাই-বোনদের অমূলক সন্দেহ আল্লাহর পছন্দ হয়নি। আসলে যারা সৃষ্টিকর্তার ওপর বিশ্বাস রাখে না, সৃষ্টিকর্তা কখনোই তাদের মূল্য দেন না। এ জন্য আমি সবসময় আল্লাহর কাছে এই দুআ করি, 'হে আল্লাহ, আপনি তাদের মনে আপনার প্রতি ঈমান সৃষ্টি করে দিন। তারা শৈশবে আমাকে যেভাবে প্রতিপালন করে বড় করেছেন, আপনি তাদের সেভাবে আপনার দ্বীনের জন্য যোগ্য করে তুলুন।'

সমাপ্তি

সত্য দ্বীনকে চিনতে পেরে আয়িশা আর মারইয়াম ঝাঁপ দিয়েছিল অজানা গন্তব্যে। যাত্রা এখনো শেষ হয়নি তাদের। গন্তব্য এখনো বহুদূর। তাদের বিস্ময়কর আর রহমতে ভরা জীবনের গল্প শুনলে চেতন-অবচেতন মনে সবাই আল্লাহর কুদরতের সামনে নত হয়ে যায়। গলে যায় পাষাণ হৃদয়ও।

এই দুই বোনের ত্যাগ, বিসর্জন ও অবিশ্বাস্য ঈমানি শক্তি যুগে যুগে শত শত তরুণ-তরুণীকে প্রেরণা জোগাবে, আলোর সন্ধান দেবে সত্যের অনুসন্ধানীকে—এই প্রত্যাশায় তাদের জীবনের কিছু খণ্ডিত অংশ মলাটবন্ধ করা হলো। কিন্তু ছাপার হরফে জীবনের গল্প আর কতটুকুই-বা তুলে ধরা যায়! এ গল্পের সমাপ্তি হোক জান্নাতে পা রাখার মাধ্যমে। আমাদের সবার প্রার্থনা—মহান আল্লাহ আগামী দিনগুলোতেও যেন আয়িশা ও মারইয়ামের হৃদয়কে দ্বীনের ওপর অটল রাখেন।

Scanned with CamScanner